

অনলাইন ম্যাগাজিন

মহাপ্রার্থনা

জুলাই ২০২৫ | ১৩ তম সংখ্যা

স্বদেশের সাথে প্রবাসের অনন্য সেতু বন্ধন

সম্পর্কের নতুন দিগন্ত:

বাংলাদেশ-চায়নার নব মেরুকরণ

China, Bangladesh always cooperate toward a better future

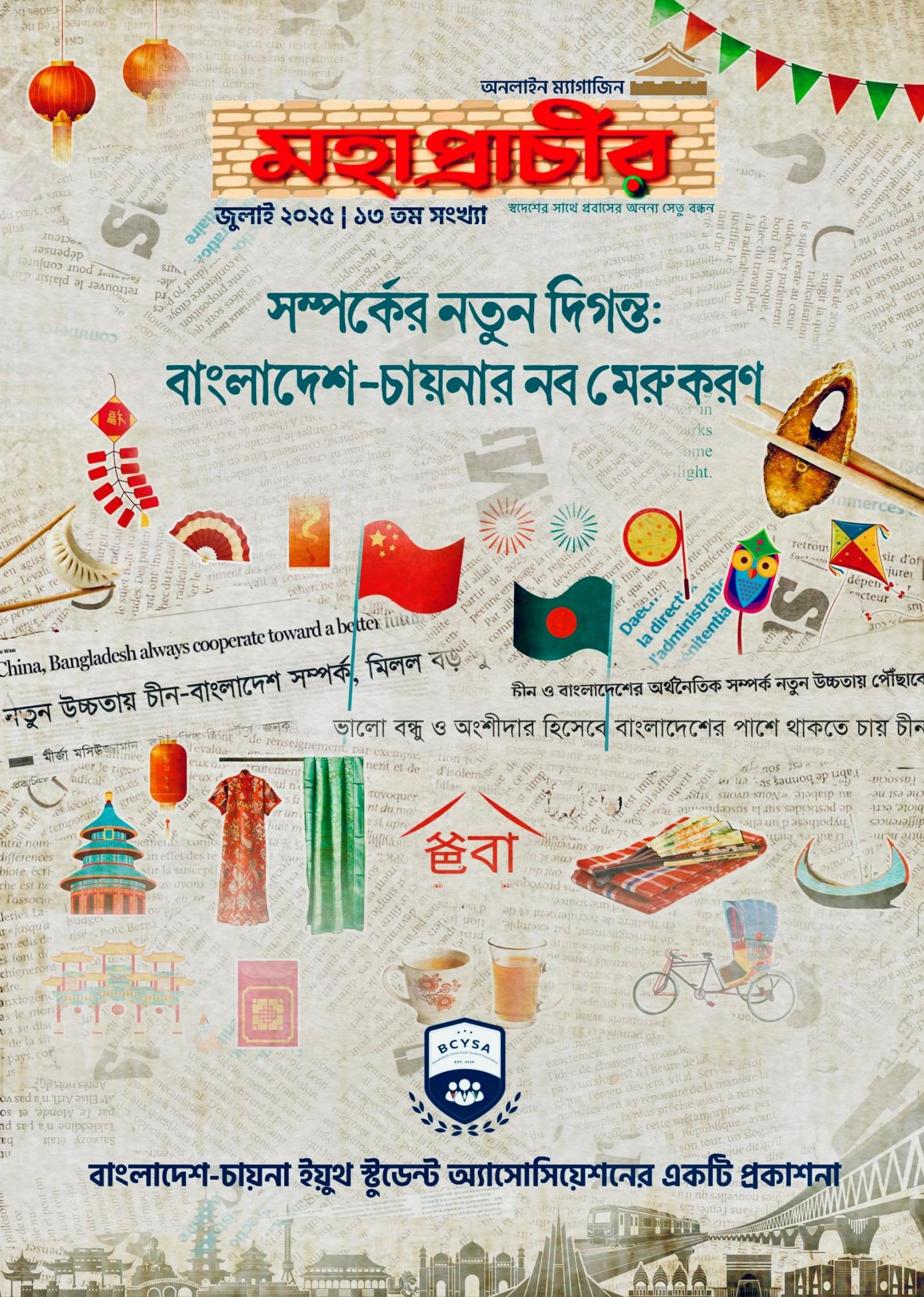
নতুন উচ্চতায় চীন-বাংলাদেশ সম্পর্ক, মিলন বড়

চীন ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে

ভালো বন্ধু ও অংশীদার হিসেবে বাংলাদেশের পাশে থাকতে চায় চীন

স্বা

বাংলাদেশ-চায়না ইয়ুথ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের একটি প্রকাশনা



সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক	:	জান্নাতুল আরিফ
নির্বাহী সম্পাদক	:	মো: মনিরুজ্জামান
সহযোগী সম্পাদক	:	কামারুজ্জামান
সম্পাদনা সহকারী	:	উম্মে হাবিবা সাদিয়া রাওহা বিন মেজবা মোহাম্মদ আদিল
প্রচ্ছদ ও ডিজাইন	:	নুহ ইবনে শহিদ
তত্ত্বাবধানে	:	অধ্যাপক ড. মো: সাহাবুল হক ড. এ এ এম মুজাহিদ মারুফ হাসান এ বি সিদ্দিক
প্রকাশকাল	:	সেপ্টেম্বর, ২০২৫

সম্পর্কের নতুন দিগন্ত:
বাংলাদেশ-চায়নার নব মেরুকরণ



উৎসর্গ

“যারা বাংলাদেশ-চীন সম্পর্কের সেতু গড়তে অক্লান্ত পরিশ্রম
করেছেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা।”



বাংলাদেশ-চায়না ইয়ুথ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের একটি প্রকাশনা

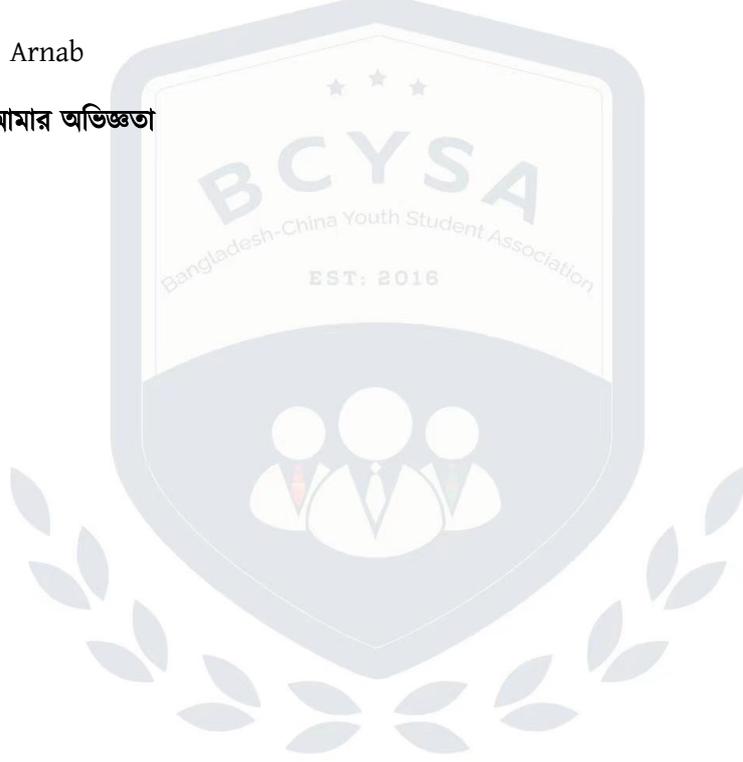
সূচিপত্র

১. বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে চীনা বৈদেশিক সহায়তার ভূমিকা: ৫০ বছরের কৌশলগত অংশীদারিত্বের ভবিষ্যৎ ০১
মোঃ সাঈদ পারেভজ
২. বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে এক নতুন দিগন্তের সূচনা: চীন ও বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগ ০৮
ডাঃ মোঃ মনিরুজ্জামান শিহাব
৩. আমার সাদা অ্যাগ্রনের প্রথম দিন ১০
ডাঃ আব্দুল্লাহ আল তানিম
৪. চীনের অগ্রযাত্রায় টেকনিক্যাল এডুকেশনের ভূমিকা ১২
কৃষ্ণ সরকার দিপু
৫. আমার দেখা চোখছিং মেডিকেল ইউনিভার্সিটি ১৫
মোঃ সাইদুর রহমান
৬. Gratitude Beyond Borders: A Bangladeshi Student's Experience of Care and Compassion in China ১৮
Dr. Toukir Hossain
৭. চাইনিজ ভদ্রতা: নীরব সম্মান আর সুপ্ত সংকেতের জগতে এক সফর ২২
নাসিমা আক্তার
৮. একটি অধ্যায়ের শেষ, নতুন স্বপ্নের শুরু ২৬
ডাঃ তৌকির হোসাইন
৯. Racing Across Traditions: The Jinji Lake Dragon Boat Festival ২৮
Raoha Bin Mejba
১০. চীনের থ্রি গর্জেস ড্যাম ও চিং হে জলাধার প্রকল্প পরিদর্শন: এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা ৩১
মোঃ আব্দুল্লাহ আল গালিব
১১. চীনের রাজধানীর শারদীয়া দুর্গাপূজা ৩৪
অর্জুন
১২. চীনের বিশ্ব বিখ্যাত থ্রি জর্জেস বাঁধ ও সাংহাই শহর আলোকিত হওয়ার গল্প ৩৬
মোহাম্মদ আদিল

সম্পর্কের নতুন দিগন্ত: বাংলাদেশ-চায়নার নব মেরু করণ



১৩. অবিশ্বাস্য তিব্বত ও কৈলাসপর্বত: পৃথিবীর ছাদে এক অদম্য আধ্যাত্মিক যাত্রা ৩৮
অর্জুন
১৪. গুইজো থেকে হুয়াংশান: আমার বিশ্ববিদ্যালয় পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা ৪৩
জিনিয়া আফরিন
১৫. বাংলাদেশ-চীন কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ৪৬
মোঃ আবু কাওসার
১৬. Nanjing to Mountain City Chongqing to Wulong to Chengdu Panda ৫৪
Almas Farhan Arnab
১৭. চীনে উচ্চশিক্ষা: আমার অভিজ্ঞতা ৫৬
মিনারা জাহান
১৮. মা ৫৮
ডাঃ শিমন সাহা



সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ ও চীনের সম্পর্ক কেবল রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বন্ধুত্ব নয়, বরং দুই দেশের মানুষের ভেতরে থাকা আন্তরিকতা, সংস্কৃতি ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার এক শক্তিশালী সেতুবন্ধন। বাণিজ্য ও অবকাঠামো উন্নয়ন আমাদের যৌথ যাত্রাকে সমৃদ্ধ করেছে, আর সংস্কৃতিক আদান-প্রদান এই সম্পর্ককে করেছে আরও উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত।

বাংলাদেশ-চায়না ইয়ুথ স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন সেই সেতুবন্ধনের অন্যতম প্ল্যাটফর্ম। প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমরা দুই দেশের তরুণদের চিন্তা, অভিজ্ঞতা ও স্বপ্নকে একত্রিত করার চেষ্টা করে আসছি। আমাদের ষাণ্মাসিক ম্যাগাজিন মহাপ্রাচীর সেই ধারাবাহিকতার প্রতিচ্ছবি। এখানে আমরা কেবল প্রবন্ধ বা অভিজ্ঞতার গল্প শেয়ার করি না, বরং একে অপরের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও চিন্তাভাবনার সেতুবন্ধন গড়ে তোলার চেষ্টা করি।

এই ১৩তম সংখ্যার জন্য আমরা বেছে নিয়েছি থিম—“সম্পর্কের নতুন দিগন্ত: বাংলাদেশ-চায়নার নব মেরুকরণ”। আমরা বিশ্বাস করি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মানবিক সম্পর্কের বিনিময়ের মধ্য দিয়েই এই নতুন মেরুকরণ বাস্তব রূপ পাবে। দুই দেশের তরুণ প্রজন্ম যত বেশি একে অপরকে জানবে, তত বেশি পারস্পরিক বোঝাপড়া ও বন্ধুত্বের পথ তৈরি হবে।

আমরা আশা করি, মহাপ্রাচীর-এর এই সংখ্যাটি পাঠকদের জন্য নতুন ভাবনা, অনুপ্রেরণা ও ইতিবাচক বার্তা বয়ে আনবে। বাংলাদেশ-চায়না সম্পর্কের এই যাত্রা হোক আরও টেকসই, আরও মঙ্গলময়, আরও গভীর।

আমরা আমাদের পাঠকদের সমর্থন ও ভালোবাসা অনুভব করি, যা আমাদের আরও ভালো কাজ করার প্রেরণা জোগায়। এই কামনা ও বিশ্বাস নিয়েই আমরা আরও সুন্দর ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

নর্থ চায়না ইলেক্ট্রিক পাওয়ার ইউনিভার্সিটি, বেইজিং, চীন।

জান্নাতুল আরিফ

সম্পাদক, মহাপ্রাচীর

সভাপতি, বাংলাদেশ-চায়না ইয়ুথ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (বিসিওয়াইএসএ)

বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে চীনা বৈদেশিক সহায়তার ভূমিকা: ৫০ বছরের কৌশলগত অংশীদারিত্বের ভবিষ্যৎ



বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক, যা দুই দেশের মধ্যে গভীর, কৌশলগত এবং বল্লেখ্য অংশীদারিত্বের প্রতীক। ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সম্পর্ক গত পাঁচ দশকে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং প্রযুক্তি সহযোগিতার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছে। বাংলাদেশের উন্নয়নযাত্রায় চীনের বৈদেশিক সাহায্য ও বিনিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, বিশেষ করে বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (BRI)-এর মাধ্যমে। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধ ও স্মার্ট জাতি হিসেবে গড়ে

তুলতে এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনে চীনের প্রযুক্তিগত ও কারিগরি সহায়তা অপরিহার্য। এই প্রবন্ধে আমরা ১০টি মূল ক্ষেত্রে চীনের সম্ভাব্য অবদান বিশ্লেষণ করব, যা বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে।

আধুনিক অবকাঠামো এবং স্মার্ট সিটি ডেভেলপমেন্টঃ আধুনিক ও টেকসই অবকাঠামো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে এবং বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হিসেবে চীন অবকাঠামো উন্নয়নে বিশ্বমানের দক্ষতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশে চীনের

নেতৃত্বাধীন প্রকল্পগুলো, যেমন পদ্মা সেতু রেল সংযোগ, কর্ণফুলী টানেল এবং পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর, ইতোমধ্যে দেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে বাড়িয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, পদ্মা সেতু বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সাথে রাজধানী ঢাকা ও অন্যান্য অঞ্চলের সরাসরি সংযোগ স্থাপন করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ত্বরান্বিত করেছে।

ভবিষ্যতে চীনের বিনিয়োগ উচ্চ-গতির রেলপথ (যেমন, ঢাকা-চট্টগ্রাম বুলেট ট্রেন), আধুনিক লজিস্টিক হাব এবং বন্দর অবকাঠামোর দিকে মনোনিবেশ করতে পারে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে একটি বাণিজ্যিক সেতু হিসেবে কাজ করার সুযোগ প্রদান করে। চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের অধীনে এই প্রকল্পগুলো বাংলাদেশকে আঞ্চলিক বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দরের সম্প্রসারণ এবং আধুনিক লজিস্টিক সুবিধা বাংলাদেশের রপ্তানি ক্ষমতা বাড়াতে পারে।



এছাড়াও, দ্রুত নগরায়ণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় চীনের স্মার্ট সিটি উন্নয়নের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যেতে পারে। চীনের শেনঝেন এবং হাংঝৌর মতো শহরে স্মার্ট ট্র্যাফিক ম্যানেজমেন্ট, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা ব্যবস্থার মডেল বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম বা নতুন পরিকল্পিত শহরগুলোতে প্রয়োগ করা সম্ভব।

উদাহরণস্বরূপ, স্মার্ট ট্র্যাফিক সিস্টেম ঢাকার যানজট কমাতে এবং জ্বালানি খরচ হ্রাস করতে সহায়ক হবে। চীনের কোম্পানিগুলো, যেমন হুয়াওয়ে, ফেজি প্রযুক্তি এবং আইওটি (ইন্টারনেট অফ থিংস) সমাধানের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়ায় অবদান রাখতে পারে। এই উদ্যোগগুলো নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে এবং শহর পরিচালনাকে আরও কার্যকর করবে।

শিল্প বহুমুখীকরণ এবং উচ্চ-প্রযুক্তি উৎপাদনঃ বাংলাদেশের অর্থনীতি এখনো তৈরি পোশাক শিল্পের ওপর ব্যাপকভাবে



নির্ভরশীল, যা দেশের রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮৪% (২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রায় ৪৬ বিলিয়ন ডলার) সরবরাহ করে। তবে, দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য

শিল্প বহুমুখীকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চীন, বিশ্বের বৃহত্তম উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে, বাংলাদেশের শিল্প খাতে উচ্চ-প্রযুক্তি উৎপাদনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

চীনা কোম্পানিগুলো বাংলাদেশে সেমিকন্ডাক্টর, ইলেকট্রনিক্স, ফার্মাসিউটিক্যালস এবং অটোমোবাইল অ্যাসেম্বলির মতো খাতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (FDI) বাড়াতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, চীনের ইলেকট্রনিক্স জায়ান্ট যেমন শাওমি বা ওপ্পো বাংলাদেশে মোবাইল ফোন উৎপাদন কারখানা স্থাপন করতে পারে, যা স্থানীয় চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি রপ্তানি বাজারে প্রবেশের সুযোগ তৈরি করবে। বাংলাদেশে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (SEZ) এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগরীতে চীনা বিনিয়োগ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে, যেখানে ২০২৩ পর্যন্ত প্রায় ১.৫ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে।

এছাড়াও, চীনা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং স্থানীয় গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, চীনের অটোমোবাইল প্রস্তুতকারক BYD বৈদ্যুতিক গাড়ি উৎপাদনে বাংলাদেশের সাথে অংশীদারিত্ব করতে পারে, যা পরিবেশবান্ধব পরিবহনের সম্ভাবনা উন্মোচন করবে। এই উদ্যোগগুলো

বাংলাদেশের শিল্পকে 'ফিনিশিং হাব' থেকে 'ম্যানুফ্যাকচারিং হাব'-এ রূপান্তরিত করবে এবং উচ্চ দক্ষতার কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে।

নবায়নযোগ্য শক্তি এবং গ্রিন টেকনোলজিঃ বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ফলে জ্বালানি চাহিদা দ্রুত বাড়ছে। ২০২৩ সালে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ২৫,০০০ মেগাওয়াট, যার মাত্র ৪% নবায়নযোগ্য উৎস থেকে আসে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা এবং জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নবায়নযোগ্য শক্তি খাতে বিনিয়োগ অত্যন্ত জরুরি। চীন, যারা বিশ্বব্যাপী সৌর ও বায়ু শক্তি প্রযুক্তিতে নেতৃত্ব দিচ্ছে, এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য একটি আদর্শ অংশীদার।

চীনের কোম্পানিগুলো বাংলাদেশে বড় আকারের সৌর ও বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বায়ু টারবাইন স্থাপনের সম্ভাবনা রয়েছে, যেখানে চীনের উন্নত টারবাইন প্রযুক্তি কাজে লাগানো যেতে পারে। ২০২৩ সালে কক্সবাজারে চীনা অর্থায়নে ৬০ মেগাওয়াটের একটি বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প শুরু হয়েছে, যা এই খাতে সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়। এছাড়া, ছাদভিত্তিক সৌর প্যানেল এবং বৃহৎ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে চীনের সহজ শর্তের ঋণ

এবং প্রযুক্তি সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ। চীনের ব্যাটারি স্টোরেজ প্রযুক্তি এবং স্মার্ট গ্রিড সলিউশন নবায়নযোগ্য শক্তির অস্থিরতা মোকাবিলায় সহায়ক হবে। এই উদ্যোগগুলো বাংলাদেশের কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে ২০৫০ সালের মধ্যে নেট-জিরো লক্ষ্যে অবদান রাখবে।



কৃষি আধুনিকীকরণ এবং খাদ্য নিরাপত্তাঃ কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি প্রধান খাত, যা দেশের জিডিপি প্রায় ১৪% এবং মোট কর্মসংস্থানের ৪০% সরবরাহ করে। তবে, জলবায়ু পরিবর্তন, জমির উর্বরতা হ্রাস এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে খাদ্য নিরাপত্তা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। চীনের আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি এবং অভিজ্ঞতা এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

চীন বাংলাদেশে উচ্চ ফলনশীল বীজ সরবরাহ, স্মার্ট ফার্মিং প্রযুক্তি (যেমন, ড্রোন-ভিত্তিক ফসল পর্যবেক্ষণ), এবং আধুনিক সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে সহায়তা করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, চীনের হাইব্রিড ধানের জাত বাংলাদেশে ইতোমধ্যে জনপ্রিয়, এবং এই ধরনের সহযোগিতা আরও প্রসারিত হতে

পারে। এছাড়া, চীনের অর্থায়নে কোল্ড স্টোরেজ এবং এগ্রো-প্রসেসিং প্ল্যান্ট স্থাপন খাদ্য অপচয় কমাতে এবং কৃষকদের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে। লবণাক্ততা সহনশীল ফসল এবং জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধী কৃষি গবেষণায় চীনের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের উপকূলীয় কৃষকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়নঃ

বাংলাদেশের বিশাল তরুণ জনগোষ্ঠী (১৮-৩৫ বছর বয়সী প্রায় ৩৫% জনসংখ্যা) একটি সম্পদ, যা দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি হতে পারে। চীন কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা (TVET) এবং উচ্চশিক্ষায় বাংলাদেশের সক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করতে পারে।

চীনের অর্থায়নে আধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে, যেখানে শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ কর্মী তৈরি হবে। উদাহরণস্বরূপ, চীনা কোম্পানি ছ্যাওয়ে ইতোমধ্যে বাংলাদেশে আইসিটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনে কাজ করছে। এছাড়া, চীনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি বাড়ানো যেতে পারে। ২০২৩ সালে প্রায় ১,০০০ বাংলাদেশি শিক্ষার্থী চীনে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছে, এবং এই সংখ্যা আরও বাড়ানো সম্ভব। যৌথ গবেষণা কেন্দ্র এবং পাঠ্যক্রম আধুনিকীকরণে চীনের

সহায়তা বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করবে।

স্বাস্থ্যসেবার উন্নতিঃ মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা বাংলাদেশের একটি প্রধান চ্যালেঞ্জ। দেশে প্রতি ১০,০০০ জনের জন্য মাত্র ৬ জন চিকিৎসক এবং ৩ জন নার্স রয়েছে (২০২২ সালের WHO তথ্য)। চীনের স্বাস্থ্যসেবা অবকাঠামো এবং প্রযুক্তির অগ্রগতি বাংলাদেশের জন্য মডেল হতে পারে।

চীন আধুনিক হাসপাতাল নির্মাণ, বিশেষায়িত চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ এবং চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণে সহায়তা করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কোভিড-১৯ মহামারীর সময় চীন বাংলাদেশকে ভ্যাকসিন এবং চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ করেছে। টেলিমেডিসিন এবং ই-হেলথ পরিষেবা চালু করার মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। এছাড়া, ওষুধ উৎপাদন এবং ভ্যাকসিন গবেষণায় যৌথ উদ্যোগ বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের স্বয়ংসম্পূর্ণতা বাড়াবে।



ডিজিটাল অর্থনীতি এবং আইসিটি অবকাঠামোঃ 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্যে ডিজিটাল অর্থনীতি এবং আইসিটি অবকাঠামোর উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২০২৩ সালে ৪৫ মিলিয়ন ছাড়িয়েছে, তবে গ্রামীণ এলাকায় উচ্চ-গতির ইন্টারনেট এখনও সীমিত। চীনের ডিজিটাল অর্থনীতির অভিজ্ঞতা এই খাতে বাংলাদেশের জন্য গেম-চেঞ্জার হতে পারে।



চীন ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ, ডেটা সেন্টার স্থাপন এবং ক্লাউড কম্পিউটিং পরিষেবাতে সহায়তা করতে পারে। হুয়াওয়ে এবং ZTE-এর মতো কোম্পানি বাংলাদেশে ৫জি নেটওয়ার্ক স্থাপনে ইতোমধ্যে কাজ করছে। ই-কমার্স এবং ফিনটেক প্ল্যাটফর্ম বিকাশে চীনের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, চীনের Alipay-এর মতো মোবাইল পেমেন্ট সিস্টেম বাংলাদেশে প্রয়োগ করা সম্ভব। এছাড়া, সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে চীনের প্রযুক্তি ও বিশেষজ্ঞ সহায়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বু ইকোনমি এবং সমুদ্র সম্পদ আহরণঃ
বাংলাদেশের ১১৮,৮১৩ বর্গকিলোমিটার
সমুদ্রসীমা বু ইকোনমির মাধ্যমে অর্থনৈতিক
উন্নয়নের বিশাল সম্ভাবনা তৈরি করেছে। চীন,
যারা সমুদ্র গবেষণা ও সম্পদ আহরণে
অগ্রগামী, এই খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান
রাখতে পারে।



চীন গভীর সমুদ্রে মাছ ধরা, মৎস্য
প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প এবং সমুদ্র পরিবহনে
বিনিয়োগ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ,
পায়রা বন্দরে চীনা অর্থায়নে আধুনিক মৎস্য
প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন করা যেতে
পারে, যা রপ্তানি আয় বাড়াবে। এছাড়া,
উপকূলীয় পর্যটন শিল্প এবং সামুদ্রিক বিজ্ঞান
গবেষণায় চীনের সহায়তা টেকসই সমুদ্র
সম্পদ ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন এবং
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাঃ বাংলাদেশ জলবায়ু
পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা শীর্ষ ১০টি দেশের
মধ্যে একটি। বার্ষিক বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং
সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি দেশের অর্থনীতি ও
জনজীবনে মারাত্মক প্রভাব ফেলে। চীন
জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল অবকাঠামো,

যেমন উন্নত বাঁধ এবং ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র
নির্মাণে সহায়তা করতে পারে।
উদাহরণস্বরূপ, চীনের অর্থায়নে ফেনী নদীর
তীরে বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প ইতোমধ্যে শুরু
হয়েছে।

এছাড়াও, আধুনিক আবহাওয়া পূর্বাভাস
পদ্ধতি এবং আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম স্থাপনে
চীনের প্রযুক্তি সহায়ক হবে। পরিবেশবান্ধব
প্রযুক্তি এবং দুর্যোগ-পরবর্তী পুনর্বাসন
কার্যক্রমে চীনের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের
জন্য মূল্যবান।

গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) এবং উদ্ভাবনঃ

জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির জন্য গবেষণা ও
উন্নয়ন (R&D) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চীন, যারা
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বায়োটেকনোলজি এবং
রোবটিক্সে নেতৃত্ব দিচ্ছে, বাংলাদেশের
গবেষণা ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করতে
পারে।

চীনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে যৌথ
গবেষণা প্রকল্প এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর কর্মসূচি
স্থানীয় উদ্ভাবন বাড়াবে। চীনের ভেঞ্চার
ক্যাপিটাল এবং ইনকিউবেটর বাংলাদেশের
স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করতে
পারে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের
ফিনটেক স্টার্টআপগুলোতে চীনা বিনিয়োগ
ডিজিটাল অর্থনীতিকে ত্বরান্বিত করবে।

বাংলাদেশ ও চীনের ৫০ বছরের
কূটনৈতিক সম্পর্ক পারস্পরিক বিশ্বাস ও
সহযোগিতার ওপর নির্মিত। উপরোক্ত ১০টি

সম্পর্কের নতুন দিগন্ত: বাংলাদেশ-চায়নার নব মেরুকরণ



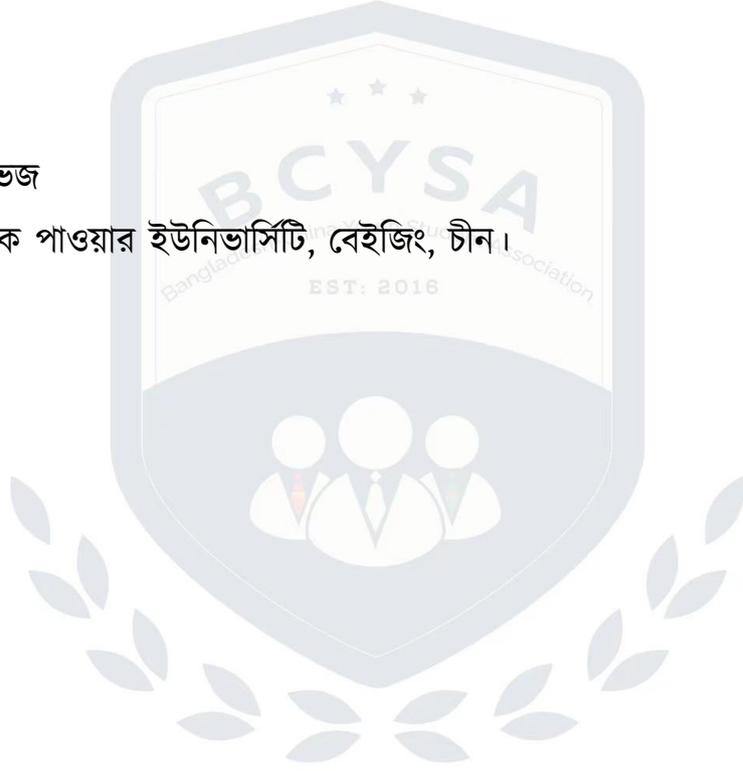
ক্ষেত্রে চীনের ধারাবাহিক বিনিয়োগ, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং কারিগরি সহায়তা বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত জাতির লক্ষ্য অর্জনে এবং বৈশ্বিক অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে

সহায়তা করবে। এই অংশীদারিত্ব দুই দেশের পারস্পরিক সমৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য নতুন সম্ভাবনা উন্মোচন করবে।



মোঃ সাঈদ পারেভজ

নর্থ-চায়না ইলেক্ট্রিক পাওয়ার ইউনিভার্সিটি, বেইজিং, চীন।



বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে এক নতুন দিগন্তের সূচনা: চীন ও বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগ

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছে চীন ও বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে। বিশেষ করে পুনর্বাসন চিকিৎসায় এই সহযোগিতা এখন বাস্তব রূপ নিচ্ছে। রাজধানীর শাহবাগে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়-এর সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল-এ গড়ে উঠেছে দেশের প্রথম রোবটিক রিহাবিলিটেশন সেন্টার। পক্ষাঘাত, স্ট্রোক, স্নায়ুজনিত জটিলতা কিংবা দীর্ঘমেয়াদি ব্যথায় ভোগা রোগীদের জন্য এটি এক আশার আলো হয়ে উঠেছে। চীনের কারিগরি সহায়তায় গড়ে ওঠা এই সেন্টারে রয়েছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, যার মধ্যে ৬২টি রোবট রয়েছে, ২২টি আবার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-ভিত্তিক। এসব রোবট রোগীর অবস্থা অনুযায়ী নিখুঁতভাবে ফিজিওথেরাপি ও পুনর্বাসন সেবা দিতে সক্ষম।

চীন সরকার এই প্রকল্পে প্রায় ২০ কোটি টাকার রোবটিক যন্ত্রপাতি উপহার দিয়েছে। শুধু যন্ত্র নয়, চীনের বিশেষজ্ঞ দল বাংলাদেশে এসে চিকিৎসক ও ফিজিওথেরাপিস্টদের প্রশিক্ষণও দিয়েছে, যাতে সেবার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছায়। এই সেন্টারটি প্রথমে আন্দোলনে

আহত শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে সেবা দেবে, পরে ধাপে ধাপে সাধারণ রোগীদের জন্যও উন্মুক্ত করা হবে। সেবার ব্যয় যেন মানুষের সাধের মধ্যে থাকে, সে বিষয়েও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

চীনের সঙ্গে এই স্বাস্থ্য সহযোগিতা শুধু হাসপাতাল বা যন্ত্রপাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। চিকিৎসা সেবা সহজ করতে ঢাকায় অবস্থিত চীনা দূতাবাস চালু করেছে 'গ্রিন চ্যানেল' ভিসা ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় বাংলাদেশি রোগীরা সহজে ও দ্রুত চীনে চিকিৎসা নিতে যেতে পারবেন। ভিসা আবেদনকারীদের জন্য বিশেষ কাউন্টার, অনলাইন আবেদন পর্যালোচনায় অগ্রাধিকার, জরুরি ক্ষেত্রে একই দিনে ভিসা ইস্যু—সবই এই উদ্যোগের অংশ। এমনকি রোগী শারীরিকভাবে উপস্থিত হতে না পারলে অনলাইন সাক্ষাৎকারের সুযোগও রাখা হয়েছে। স্থানীয় লাইসেন্সধারী ট্রাভেল এজেন্সিগুলো এখন গ্যারান্টিপত্র ও ব্যাংক ডিপোজিট সার্টিফিকেট ইস্যু করতে পারবে, ফলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের বাড়তি ঝামেলা নেই।

এই সহযোগিতার আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো 'নি হাও! চায়না-বাংলাদেশ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা

উন্নয়ন প্রদর্শনী', যা অনুষ্ঠিত হয়েছে বনানীর হোটেল সারিনায়। সেখানে চীনের ১২টিরও বেশি স্বনামধন্য হাসপাতালের প্রতিনিধি, চিকিৎসক ও কর্মকর্তারা অংশ নিয়েছেন। রোগীরা পেয়েছেন অন-সাইট ও অনলাইন পরামর্শ, চিকিৎসার আমন্ত্রণপত্র, ভিসা সহায়তা এবং সরাসরি চীনা হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ। এই আয়োজন শুধু প্রদর্শনী নয়, বরং দুই দেশের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা বিনিময়ের এক নতুন অধ্যায়।

চীন ঢাকায় একটি বড় হাসপাতাল নির্মাণের আগ্রহ প্রকাশ করেছে, যার সম্ভাব্য নাম হতে পারে 'চায়না-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ জেনারেল হাসপাতাল'। উত্তরবঙ্গে ১ হাজার শয্যার হাসপাতাল নির্মাণের পরিকল্পনাও রয়েছে, যা চীন উপহার হিসেবে দিতে চায়। ইতিমধ্যে রোবটিক ফিজিওথেরাপি যন্ত্র বাংলাদেশে এসেছে, যা এই সহযোগিতার বাস্তব রূপ।

বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থায় চীনের অবদান বহুদিনের। ওষুধশিল্পে চীনা কাঁচামাল, মেডিকেল যন্ত্র, সার্জিক্যাল টুলস, কোভিডকালে টিকা ও সরঞ্জাম—সবই এই বন্ধুত্বের নিদর্শন। হাজারো বাংলাদেশি শিক্ষার্থী চীনে চিকিৎসাবিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা নিয়েছে, যা ভবিষ্যতের জন্য এক মূল্যবান সম্পদ।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই ধরনের উদ্যোগ বিদেশে চিকিৎসা ব্যয় কমাবে, বৈদেশিক মুদ্রা রক্ষা করবে এবং দেশেই উন্নত সেবা নিশ্চিত করবে। ভারতের ওপর নির্ভরতা কমবে, এবং চীনের প্রযুক্তি ও সেবা অনেক বেশি কার্যকর ও সাশ্রয়ী হবে। তবে এর জন্য প্রয়োজন উন্নত ব্যবস্থাপনা কাঠামো, দক্ষ জনবল এবং সুশৃঙ্খল নীতিমালা।

এই রোবটিক সেন্টার শুধু একটি চিকিৎসা কেন্দ্র নয়, এটি একটি উদ্ভাবনী কেন্দ্র। এখানে প্রযুক্তি, মানবতা, গবেষণা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা মিলিত হয়েছে। চীন ও বাংলাদেশের এই যৌথ প্রয়াস ভবিষ্যতের স্বাস্থ্যসেবায় এক নতুন পথ দেখাবে। এটি শুধু চিকিৎসার উন্নয়ন নয়, বরং একটি মানবিক বিপ্লব, যা অসুস্থ মানুষের জীবনে নতুন আশার সঞ্চার করবে।



ডাঃ মোঃ মনিরুজ্জামান শিহাব
পিএইচডি গবেষক, ক্যাপিটাল মেডিকেল
বিশ্ববিদ্যালয়, বেইজিং, চীন
সাধারণ সম্পাদক, বিসিওয়াইএসএ

আমার সাদা অ্যাপ্রনের প্রথম দিন



ছোটবেলা থেকেই সাদা অ্যাপ্রন দেখলে একজন ডাক্তারের ছবি আমার কল্পনায় ভেসে উঠত। কিন্তু যখন সেটা নিজের গায়ে জড়ালাম, তখন যে অনুভূতি হলো, সেটা শুধু গর্ব নয়—দায়িত্ব, ভয় আর বিস্ময়ের এক মিশ্র অনুভূতি।

ইন্টার্নশিপের প্রথম দিন আমি প্রবেশ করি **First Affiliated Hospital of Zhengzhou University** - তে। এটি শুধু চীনের নয়, বরং বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম এবং সর্বাধুনিক হাসপাতালগুলোর একটি। সেখানেই শুরু হয় আমার বাস্তব চিকিৎসা জীবনের পথচলা।

ইন্টার্নশিপ শুরুর অনেক আগেই, আমার আগ্রহ আর আন্তরিকতার কারণে শিক্ষকদের অনুমতি নিয়ে আমি একাধিক সার্জারি অপারেশনে সরাসরি অংশ নিয়েছি। একজন

বিদেশি ছাত্র হিসেবে এমন সুযোগ পাওয়া আমার জন্য ছিল এক বিশাল অর্জন। আমি দেখেছি কীভাবে উন্নত প্রযুক্তি, নিখুঁত টিমওয়ার্ক এবং মানবিকতা মিলে চীনের চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

চীনা ডাক্তারদের সহযোগিতা, আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং রোগীদের প্রতি তাঁদের আন্তরিক আচরণ আমাকে মুগ্ধ



সম্পর্কের নতুন দিগন্ত: বাংলাদেশ-চায়নার নব মেরুকরণ



করেছে। ভাষার কিছুটা বাধা থাকলেও শেখার আগ্রহ আমাকে এগিয়ে নিয়েছিল—কখনো পর্যবেক্ষণ করে, কখনো সরাসরি হাতে-কলমে কাজ করে।

প্রথম দিনেই বুঝে গিয়েছিলাম—এই অ্যাপ্রন শুধু পরিচয়ের নয়, এটি একটি দায়িত্ব এবং প্রতিশ্রুতি—মানুষের পাশে থাকার, তাদের কষ্ট বুঝে সহানুভূতির সঙ্গে সেবা করার। সেই প্রতিশ্রুতির প্রথম অধ্যায় শুরু হয়েছিল First Affiliated Hospital of Zhengzhou University এর

করিডোরে—যেখানে স্বপ্ন, বিজ্ঞান ও সেবার মেলবন্ধন ঘটেছে।



ডাঃ আব্দুল্লাহ আল তানিম

ফার্স্ট অ্যাফিলিয়েটেড হাসপাতাল জেংঝৌ বিশ্ববিদ্যালয়, জেংঝৌ, চায়না।

চীনের অগ্রযাত্রায় টেকনিক্যাল এডুকেশনের ভূমিকা



বিশ্বের বুকে চীন আজ একটি প্রযুক্তি ও শিল্প বিপ্লবের প্রতীক। তাদের এই অগ্রগতির পেছনে রয়েছে সুপারিকল্লিত শিক্ষানীতি, যার গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হলো কারিগরি ও টেকনিক্যাল শিক্ষা। চীন বুঝতে পেরেছে—একটি জাতিকে উন্নত করতে হলে কেবল বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের একাডেমিক শিক্ষা নয়, প্রয়োজন হাতে-কলমে দক্ষতা অর্জনের সুযোগ। আর সেই উপলব্ধি থেকেই শুরু হয়েছে তাদের টেকনিক্যাল শিক্ষা বিপ্লব।

টেকনিক্যাল শিক্ষার ভিত্তি ও বিস্তারঃ চীনে বর্তমানে প্রায় ১১,০০০-এর বেশি ভোকেশনাল ও টেকনিক্যাল কলেজ এবং

ইনস্টিটিউট রয়েছে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, ২০২৩ সালে দেশটিতে প্রায় ৩০ মিলিয়ন শিক্ষার্থী টেকনিক্যাল শিক্ষা গ্রহণ করেছে, যা বিশ্বের মধ্যে অন্যতম বৃহৎ একটি সংখ্যা। এখানকার ভোকেশনাল শিক্ষাগুলো শুধু ইঞ্জিনিয়ারিং বা নির্মাণ খাতেই সীমাবদ্ধ নয়—এর মধ্যে রয়েছে আধুনিক কৃষি, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, রোবোটিক্স, AI, 5G টেকনোলজি, বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, রিনিউয়েবল এনার্জি, এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যসহ বিস্তৃত খাত।

চীন সরকারের “Made in China 2025” এবং “Dual Education System” নীতিমালায় টেকনিক্যাল শিক্ষা একটি মূল স্তম্ভ হিসেবে কাজ করছে। এই শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্ররা শুধু শ্রেণিকক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না—তারা শিল্পপ্রতিষ্ঠানে সরাসরি কাজ করে



হাতে-কলমে শেখে। অনেক প্রতিষ্ঠান ‘school-enterprise cooperation’ মডেল চালু করেছে, যেখানে শিক্ষার্থী ও শিল্পপতিরা একত্রে কাজ করে বাস্তব সমস্যা সমাধান করে।

চীনের শিল্পখাতে টেকনিক্যাল শিক্ষার প্রভাবঃ টেকনিক্যাল শিক্ষার মাধ্যমে চীনে দ্রুততার সঙ্গে তৈরি হয়েছে এক দক্ষ শ্রমবাজার। Foxconn, Huawei, BYD, Xiaomi-এর মতো জায়ান্ট কোম্পানিগুলোর কারিগরি বিভাগে লাখ লাখ টেক-ট্রেন্ড কর্মী কাজ করছে, যাদের বড় অংশই ভোকেশনাল শিক্ষা থেকে উঠে এসেছে। এছাড়াও গ্রামীণ অঞ্চলেও ছোট কারখানা, কৃষিপ্রযুক্তি কেন্দ্র, রিনিউয়েবল এনার্জি

স্টেশন এবং মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপে টেকনিক্যাল গ্র্যাজুয়েটরা কাজ করছে, যা প্রমাণ করে—টেকনিক্যাল শিক্ষা শহরকেন্দ্রিক নয়, এটি সামগ্রিক জাতীয় উন্নয়নের হাতিয়ার।

বাংলাদেশের জন্য চীনের শিক্ষা একটি অনুকরণীয় মডেল, বাংলাদেশ একটি তরুণ জনসংখ্যার দেশ। প্রতি বছর লাখ লাখ তরুণ কর্মসংস্থান খুঁজছে, কিন্তু কারিগরি দক্ষতার অভাবে অনেকে কর্মবাজারে জায়গা করে নিতে পারে না। এই প্রেক্ষাপটে চীনের মডেল অনুসরণ করে বাংলাদেশও তার কারিগরি শিক্ষাকে আধুনিক ও শিল্প-কেন্দ্রিক করে তুলতে পারে।



BCYSA (Bangladesh China Youth Students Association) এমন একটি সংগঠন, যা দুই দেশের মধ্যে তরুণদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য সেতুবন্ধন গড়ে তুলছে। অনেক বাংলাদেশি শিক্ষার্থী আজ চীনের বিভিন্ন প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে টেকনিক্যাল বিষয় নিয়ে—

সম্পর্কের নতুন দিগন্ত: বাংলাদেশ-চায়নার নব মেরুকরণ



যেমন মেকানিক্যাল ডিজাইন, অটোমেশন, ডেটা সায়েন্স, কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং নিউ এনার্জি টেকনোলজি।

চীন সরকার প্রতি বছর China Scholarship Council (CSC)-এর মাধ্যমে অসংখ্য বাংলাদেশি শিক্ষার্থীকে স্কলারশিপ দিচ্ছে, যার মাধ্যমে তারা উচ্চতর টেকনিক্যাল ডিগ্রি অর্জন করছে এবং দেশে ফিরে গিয়ে বিভিন্ন শিল্প ও শিক্ষা খাতে অবদান রাখছে।

চীনের উন্নয়নের গল্প আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে—কারিগরী শিক্ষা ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। তারা শিক্ষা ও শিল্পের মধ্যে একটি কার্যকর সংযোগ স্থাপন করেছে, যার ফলে তাদের অর্থনীতি স্থায়ীভাবে শক্তিশালী হয়েছে। বাংলাদেশও যদি চীনের মতো দক্ষতা উন্নয়নের ওপর জোর দেয়, তাহলে আমাদের তরুণ প্রজন্ম আগামী দিনে

শুধু দেশের উন্নয়নেই নয়, আন্তর্জাতিক পর্যায়েও অবদান রাখতে পারবে।

BCYSA-এর মাধ্যমে আমরা সেই ভবিষ্যতের ভিত্তি তৈরি করছি—যেখানে বাংলাদেশের তরুণরা চীনের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নিয়ে নিজেদের গড়বে, এবং দুই দেশের বন্ধুত্ব আরও দৃঢ় হবে।



কৃষ্ণ সরকার দিপু
বি.এসসি ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং
হবেই ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি,
উহান, চীন

আমার দেখা চোংছিং মেডিকেল ইউনিভার্সিটি



পাহাড়ি শহরের বুকে এক মেডিকেল ক্যাম্পাস। চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমের পাহাড়ি নগরী চোংছিং। ইয়াংজি নদী বয়ে গেছে শহরের বুক চিরে। এই নগরীতেই অবস্থিত চোংছিং মেডিকেল ইউনিভার্সিটি (CQMU)— যা শিক্ষা, গবেষণা এবং চিকিৎসা প্রশিক্ষণের এক সমন্বিত প্রতিষ্ঠান। ইউয়ানজিয়াগাং ও জিনইউন—দুটি প্রধান ক্যাম্পাসজুড়ে বিস্তৃত এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিদিন নতুন নতুন জ্ঞানচর্চা ও উদ্ভাবনের কেন্দ্র হয়ে উঠছে।

শিক্ষার্থী ও শিক্ষকঃ বর্তমানে CQMU-তে পূর্বকালীন শিক্ষার্থী প্রায় ২৭,৭০০ জন। এদের মধ্যে স্নাতক প্রায় ১৮,০০০, মাস্টার্স ৭,০০০ জনের বেশি, পিএইচডি ১,৬০০ জন

এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী প্রায় ৫০০ জন। এখানে শিক্ষক সংখ্যা প্রায় ২,৫০০ জন। এদের মধ্যে ১,৭০০ জনের বেশি রয়েছেন প্রফেসর ও সহযোগী প্রফেসর। ডক্টরাল সুপারভাইজার আছেন ৪৩০ জনেরও বেশি, আর মাস্টার্স সুপারভাইজার ১,৬০০ জনের বেশি।

হাসপাতাল ও চিকিৎসা সেবাঃ CQMU-এর অধীনে রয়েছে ১৫টি সংযুক্ত হাসপাতাল, যেখানে শয্যা সংখ্যা প্রায় ২১,০০০। প্রতি বছর প্রায় ১ কোটি ৫৪ লাখ রোগী বহির্বিভাগে চিকিৎসা নেন এবং ৬ লাখ ৬০ হাজারের বেশি রোগী ভর্তি হয়ে চিকিৎসা

পান। চিকিৎসা শিক্ষার্থীদের জন্য এটি এক বিশাল বাস্তব অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র।

উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা: CQMU কেবল স্নাতকে নয়, উচ্চশিক্ষাতেও শক্তিশালী অবস্থান গড়ে তুলেছে। এখানে রয়েছে ৫৩টি মাস্টার্স প্রোগ্রাম, ২৬টি ডক্টরাল প্রোগ্রাম এবং ৫টি পোস্টডক্টরাল প্রোগ্রাম। গবেষণার জন্য আছে একাধিক জাতীয় ও প্রাদেশিক গুরুত্বপূর্ণ ল্যাবরেটরি, ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ সেন্টার এবং বিশেষায়িত গবেষণা প্রতিষ্ঠান। গত কয়েক বছরে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে ১০ হাজারেরও বেশি আন্তর্জাতিক গবেষণাপত্র। CQMU-তে উদ্ভাবিত HIFU (High-intensity Focused Ultrasound Therapy) প্রযুক্তি আজ বিশ্বজুড়ে ব্যবহৃত হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের সুযোগ-সুবিধা: ২০০১ সাল থেকে CQMU আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ভর্তি শুরু করে। বর্তমানে ৬০টিরও বেশি দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে পড়াশোনা করছেন। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা **International Education College (CIE)** রয়েছে, যা ভর্তি প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে ভিসা, একাডেমিক পরামর্শ ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম—সবকিছু পরিচালনা করে।

• **আবাসন:** আধুনিক হোস্টেল, যেখানে সিঙ্গেল ও ডাবল রুমের সুবিধা রয়েছে।

• **লাইব্রেরি:** ১১ লাখ বই ও আন্তর্জাতিক জার্নালে সমৃদ্ধ।

• **খেলাধুলা ও বিনোদন:** স্টেডিয়াম, জিম, সুইমিং পুল ও বাস্কেটবল কোর্ট।

• **ক্যান্টিন:** চাইনিজ খাবারের পাশাপাশি মুসলিম ও আন্তর্জাতিক খাবারের ব্যবস্থা।

• **স্কলারশিপ:** Chinese Government Scholarship ও Chongqing Mayor Scholarship, যা টিউশন ফি, আবাসন খরচ ও জীবনযাপনের ভাতা বহন করে।

র‍্যাঙ্কিং ও স্বীকৃতি: আন্তর্জাতিকভাবে CQMU-এর অবস্থান ক্রমশ উন্নতি করছে:

• CWUR ২০২৫: বিশ্বে #651
• SCImago ২০২৫: বিশ্বে #494
• EduRank ২০২৫: চীনে ১২৫তম, বিশ্বে ১২৫১তম

বিষয়ভিত্তিকভাবে মেডিসিনে বিশ্বে ৩০৫তম স্থান অর্জন করেছে।

আমার অভিজ্ঞতা ল্যাভে শেখার দিনগুলো: আমি এখনো এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী এবং বর্তমানে গবেষণাগারে কাজ করছি। আমার গবেষণার বিষয় হলো লিভার ফাইব্রোসিস (Liver Fibrosis)। প্রতিদিন ল্যাভে প্রবেশ করলে মনে হয়, আমি যেন বিজ্ঞানের এক নতুন দিগন্তে প্রবেশ করছি। আধুনিক যন্ত্রপাতি, আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা সুবিধা আর শিক্ষকদের

সম্পর্কের নতুন দিগন্ত: বাংলাদেশ-চায়নার নব মেরু করণ



পরামর্শে আমরা নানা পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণে অংশ নিই। লিভার ফাইব্রোসিসের মতো জটিল একটি রোগ নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আমি শিখছি কীভাবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষের জীবনে সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে।

গবেষণা নির্ভর এই কাজ আমাকে নতুনভাবে শিখতে অনুপ্রাণিত করছে। এখানে আমি শুধু পাঠ্যবই নয়, বাস্তব গবেষণার মাধ্যমে চিকিৎসা বিজ্ঞানের গভীরতা অনুধাবন করতে পারছি। ভিন্ন

দেশের সহপাঠীদের সঙ্গে একসাথে ল্যাবে কাজ করার ফলে আন্তর্জাতিক পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া সহজ হচ্ছে। হোস্টেল, ক্যান্টিন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আর আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য নানা আয়োজন আমার জীবনে ভিন্ন মাত্রা এনেছে। বিদেশের মাটিতে থেকেও আমি যেন ঘরের মতো পরিবেশ পাচ্ছি। আমার কাছে CQMU শুধু একটি বিশ্ববিদ্যালয় নয়, বরং গবেষণার মাধ্যমে নতুন দিগন্ত উন্মোচনের এক পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা।



মোঃ সাইদুর রহমান
চোংছিং মেডিকেল ইউনিভার্সিটি

Gratitude Beyond Borders: A Bangladeshi Student's Experience of Care and Compassion in China



As a Bangladeshi, football has always been a part of my identity. Like many of my fellow countrymen, I am passionate about the sport. In May of this year, while playing a friendly football match with friends, I suffered a severe injury after a hard tackle. I was immediately unable to stand on my own. My friends quickly came to my aid, carrying me from the field to a taxi, and we rushed to the hospital.

At the same time, we contacted the College of International Education. Our respected teacher, Ms. Shannon, advised us to inform the insurance

provider right away, assuring us that if surgery was required, the costs would be covered. Following her guidance, I proceeded with the necessary steps. Throughout this entire process, my juniors from Bangladesh and my dear old friend and classmate, Choi from Korea, helped me with all the translation and communication with the medical staff and authorities.

At the hospital, the doctors conducted X-rays and mentioned that I might need an MRI if things didn't improve. Unfortunately, the pain persisted for the next three days,

prompting me to undergo the MRI. Upon receiving the results, the doctors informed me that surgery was necessary and should be performed as soon as possible.

I immediately informed my supervisor, Professor Dr. Wang Hong Liang. With genuine concern, he reassured me not to worry and promised to find the best orthopedic surgeon for my case. The insurance company was also extremely responsive; they asked me to submit all necessary documents and speak with the surgeon. Once that was completed, they approved my file and assured me that all medical expenses would be covered upon hospital admission.



Due to the general anesthesia required for surgery, a guarantor was needed. Without hesitation, Choi stepped up and signed the necessary documents, saying, “We are family, brother. I can do this for you.” His words touched my heart deeply.

On the morning of my surgery, my supervisor, Professor Wang, sent a kind message: “Don’t worry, stay

calm.” Before the operation, the orthopedic surgeon met with me and offered his sincere apologies for not operating on me earlier. He explained that although my teacher had requested my surgery be done first thing in the morning, he had committed to another elderly patient. I assured him that I understood and appreciated his honesty and dedication.

After the surgery, both my professor and the surgeon stood beside my hospital bed to check on me. The surgeon once again apologized to my teacher, showing a rare humility and humanity for someone of his seniority and stature. After explaining my post-surgery care, he left with warmth and encouragement. Before leaving, Professor Wang kindly handed me an envelope containing money, saying, “Take care of yourself, and don’t hesitate to call me if you need anything.” His generosity and fatherly concern will remain etched in my memory.

During the first two days of my hospital stay, I was bedridden and unable to use the bathroom independently. My Bangladeshi junior, Sheefat, and my Korean friend, Choi, took care of me selflessly, assisting with my toilet needs and cleaning without hesitation. They even slept on the hospital floor on small mattresses to be by my side, reflecting a level of friendship and

compassion that transcends borders, nationalities, and even blood relations.

The College of International Education remained in constant contact with me, and after the surgery, the Dean personally visited me at the hospital. The sense of community and care I received from my university was remarkable and comforting during a very difficult time.

During my recovery, I was deeply



moved by the care and solidarity shown by my fellow classmates from various countries. Friends, classmates, and juniors from Bangladesh, Pakistan, Jordan, Iran, Mauritania, and Yemen frequently visited me at the hospital, bringing fruits, cakes, and other items—not for formality, but out of genuine concern for my well-being. Their visits were not just about gifts, but heartfelt expressions of support and friendship. They repeatedly asked if there was anything they could do to help, always ready to offer their time and assistance.

One moment that particularly touched me was when some of my Bangladeshi juniors came to visit while I was asleep. Rather than waking me, they quietly waited outside for over an hour and later returned just to check in on me. On another occasion, my friend from Jordan came late at night after a long day of duties, simply to see how I was doing. These acts of kindness and empathy reflect the true meaning of friendship—selfless, caring, and beyond cultural or national boundaries.

From the moment of my injury through surgery and recovery, I witnessed firsthand the compassion, efficiency, and care embedded within China's healthcare system and its people. It has made me reflect on what every individual seeks in a country—security, accessible healthcare, quality education, and fair job opportunities. China provides these fundamental aspects at a world-class level, not only to its citizens but also to international students like me. It is no wonder people choose to come to China and feel proud to be part of its community.

সম্পর্কের নতুন দিগন্ত: বাংলাদেশ-চায়নার নব মেরুকরণ



哈医大二院国际医疗中心与多学科
联合成功为国际留学生实施关节镜
手术 为异国学子健康保驾护航

哈尔滨医科大学附属第二医院
2025年05月28日 18:56 黑龙江 611人

哈尔滨医科大学 附属第二医院

哈医大二院国际医疗中心与多学科联合成
功为国际留学生实施关节镜手术
为异国学子健康保驾护航

近日，哈医大二院国际医疗中心联合
骨外科四病房（关节疾病微创外科、运动
医学科）为孟加拉籍留学生 TOUKIR
HOSSAIN成功实施关节镜下前交叉韧带重
建手术。从预约问诊到术后康复，这场历
时5天的“医疗旅程”，通过全链条国际化
医疗服务体系，让异国学子感受到跨越语
言与文化壁垒的健康守护。出院前夕，哈
医大二院党委副书记王洪亮看望了留学生

Dr. Toukir Hossain (海洋) 等6个朋友

哈尔滨医科大学... 51 188 20 Commer

I earnestly hope that one day my beloved Bangladesh will also have the facilities and support systems that empower every citizen, regardless of economic status. Above all, I hope everyone in this world is blessed with friends like Choi and juniors like Sheefat—individuals who show the true meaning of love, friendship, and care.



Dr. Toukir Hossain
MBBS, MRCEM-UK (Primary)
MD-Resident, Critical Care Medicine
Harbin Medical University
City: Harbin
Province: Heilongjiang.

চাইনিজ ভদ্রতা: নীরব সম্মান আর সুষ্ঠু সংকেতের জগতে এক সফর



আপনি প্রথমবারের মতো চীনে এসেছেন। সবার কাছেই শুনেছেন চীনা নাগরিকরা খুবই বন্ধুসুলভ। আপনিও বেশ বন্ধুসুলভ একজন মানুষ। দেশে আপনার বন্ধুত্বের প্রশংসা সবার মুখে। চীনে আসার বেশ কিছুদিন ইতিমধ্যে পার হয়ে গেছে, কিন্তু আপনি কোনোভাবেই বুঝে উঠতে পারছেন না সমস্যাটা কোথায় হচ্ছে। সম্পর্ক বেশ ভালোই গড়ে তুলছেন আপনি, কিন্তু কিছুদিন পর কেউ আর আপনার সাথে যোগাযোগ রাখছে না বা আপনার ওপর আগ্রহ দেখাচ্ছে না। কিন্তু সমস্যাটা আসলে কোথায়? কেউ আপনাকে কিছু বলছেনও না। চলুন আরও দুই-একটা কথা বলি আপনাকে।

ধরুন, এক বন্ধুর বাসায় নিমন্ত্রণ পেয়েছেন। আনন্দের বশে সঙ্গে করে একটা বিলাসবহুল ঘড়ি নিয়ে গেলেন উপহার হিসেবে। দরজার সামনে আপনার বন্ধুটি থমকে গেল, তার মুখে হালকা এক হাসি—কিন্তু চোখ বলছিল অন্য কথা। পরে জানতে পারলেন, ঘড়ি চীনে মৃত্যুর প্রতীক!

চাইনিজ এটিকেট মানে শুধু “ধন্যবাদ” বলা নয়, বরং প্রতিটি ছোট কাজের মধ্যে ভদ্রতা, আত্মসম্মান ও সম্মানের ছায়া থাকে। চলুন, চাইনিজ সামাজিক ভদ্রতা বা etiquette-এর এই জটিল, কিন্তু মায়াবী জগতে একটু ডুব দেই।

উপহার দেওয়ার সময় কী জিনিস এড়িয়ে চলবেন?

চীনে উপহার দেওয়া একটি শিল্প। ভুল উপহার মানে হতে পারে সম্পর্কের শুরুতেই ভুল বার্তা।

নিষিদ্ধ বা এড়িয়ে চলার মতো উপহার:

ঘড়ি (钟 - zhōng): 'ঘড়ি দেওয়া' চীনা ভাষায় “送钟 (sòng zhōng)”, যার উচ্চারণ মৃত্যুতে বিদায় জানানোর মতো শোনায়। এটি মৃত্যুর প্রতীক।



ছাতা (伞 - sǎn): ছাতার চীনা উচ্চারণ “sǎn” মানে বিচ্ছিন্ন হওয়া। এটি সম্পর্কের ফাটল বোঝাতে পারে।

সাদা বা কালো রঙের জিনিস: সাধারণত এই রংগুলো শোক বা মৃত্যুর সাথে জড়িত। উৎসব বা আনন্দের সময় রঙিন বা লাল প্যাকেটই গ্রহণযোগ্য।

নাশপাতি (梨 - lí): “lí” শব্দটি “বিদায়” শব্দের মতো শোনায়। প্রেমিক-প্রেমিকা বা বন্ধুদের মাঝে বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে।

চিনামাটির বা কাচের তৈজসপত্র: এগুলো ভেঙে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে, যা সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার প্রতীক ধরা হয়।

বিজোড় সংখ্যার উপহার: উপহার দেওয়ার সময় জোড় সংখ্যা পছন্দ করা হয়। তবে ‘৮’ খুবই সৌভাগ্যের প্রতীক, কারণ এর উচ্চারণ “ba” শুনতে “ধনী হওয়া” (发 - fā) এর মতো।

ভালো উপহার হতে পারে:

চা, স্বাস্থ্যকর খাবার, বিদেশি চকোলেট, বই (বিশেষত যদি সেটা চিন্তাশীল হয়), ছোট কারুশিল্প ইত্যাদি।

টিপস: উপহার কখনও এক হাতে দেবেন না, দুই হাতে দিন। এবং কেউ যদি প্রথমবার না নেয়, অবাক হবেন না—এই ‘না’ বলা আসলে ভদ্রতা।

খাবার টেবিলে ভদ্রতা: আচরণেই আসল শ্রদ্ধা

চীনে খাবার মানে শুধু ক্ষুধা মেটানো নয়, এটা সামাজিক বন্ধনের এক গুরুত্বপূর্ণ



অংশ। আর এখানে খাবার টেবিলের শিষ্টাচার ঠিকঠাক না মানলে কিন্তু চুপচাপ কেউ কিছু বলবে না—কিন্তু আপনি ধীরে ধীরে ‘ভদ্র অতিথি’ তালিকা থেকে ছিটকে পড়বেন।

চপস্টিক ব্যবহারের কিছু মূল নিয়ম:

খাবারে খোঁচা দেবেন না। এটা অশোভন এবং শিশুসুলভ আচরণ ধরা হয়।

চপস্টিক খাবারে সোজা করে বসিয়ে রাখবেন না, বিশেষ করে ভাতে। এটি মৃতদের জন্য ধূপ জ্বালানোর প্রতীক।

চপস্টিক দিয়ে অন্য কাউকে খাবার দেবেন না। খাবার কাউকে দিতে হলে প্লেট ব্যবহার করুন।

খাবার টেবিলে কিছু বাড়তি ভদ্রতা:

বয়োজ্যেষ্ঠ আগে খাবেন: বড়দের আগে খাওয়া শুরু করাটা অভদ্রতা।

নিজের প্লেট থেকে খাবার তুলুন: অন্যের থালা বা কমন প্লেট থেকে সোজা মুখে খাবার নেওয়া উচিত নয়।

সব খাবার শেষ করবেন না: এটা লোভী মনে হতে পারে। শেষ খাবারটা রেখে দিলে বোঝায়, আপনি ভদ্রভাবে আতিথেয়তা গ্রহণ করেছেন।

চুপচাপ খাবার শুরু করবেন না: আগে বলবেন “开动了 (kāi dòng le)” – অর্থাৎ, “আমি খাচ্ছি”, যেন অন্যরাও শুরু করতে পারেন।

সামাজিক কথাবার্তায় সংযম এবং সংকেত

কেউ যদি খুব নরমভাবে বলে: “Let me think about it” – সেটা প্রায় নিশ্চিতভাবে ‘না’ বোঝায়। চীনারা সরাসরি “না” বলতে চায় না, কারণ এটি অন্যকে অপমান করার মতো শোনাতে পারে।

তর্ক বা বিতর্ক জনসমক্ষে এড়িয়ে চলা উচিত। এটা সম্মানহানির শামিল। চীনা সমাজে “মুখ রক্ষা” (face-saving) বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি কাউকে উপদেশ দিতে চাইলে সেটা ব্যক্তিগতভাবে এবং সম্মান রেখে বলতে হবে।

লাল খাম এবং অর্থের সৌজন্য

বিশেষ উৎসবে (যেমন চাইনিজ নিউ ইয়ার, বিয়ে, জন্মদিনে) লাল খাম (红包 - hóng bāo) এর মাধ্যমে অর্থ উপহার দেওয়া যায়। এই খামে রাখা অর্থের অংকেও ভদ্রতার ছাপ থাকে।

৪ (四 - sì) মানে “মৃত্যু”র মতো শোনায়ে, তাই এটি এড়িয়ে চলা উচিত।

৮ (八 - bā) মানে সৌভাগ্য ও সম্পদ।

৬৬, ৮৮ বা ১৬৮-এর মতো সংখ্যাগুলো খুবই শুভ ও জনপ্রিয়।

শেষ কথা: আপনি অতিথি, কিন্তু সেই সাথে আপনি আপনার সংস্কৃতির এক নীরব বার্তাবাহকও। চীনে একজন অতিথিকে সম্মানের চোখে দেখা হয়, কিন্তু সেই অতিথিকেও নিজেকে সম্মানজনকভাবে

সম্পর্কের নতুন দিগন্ত: বাংলাদেশ-চায়নার নব মেরু করণ



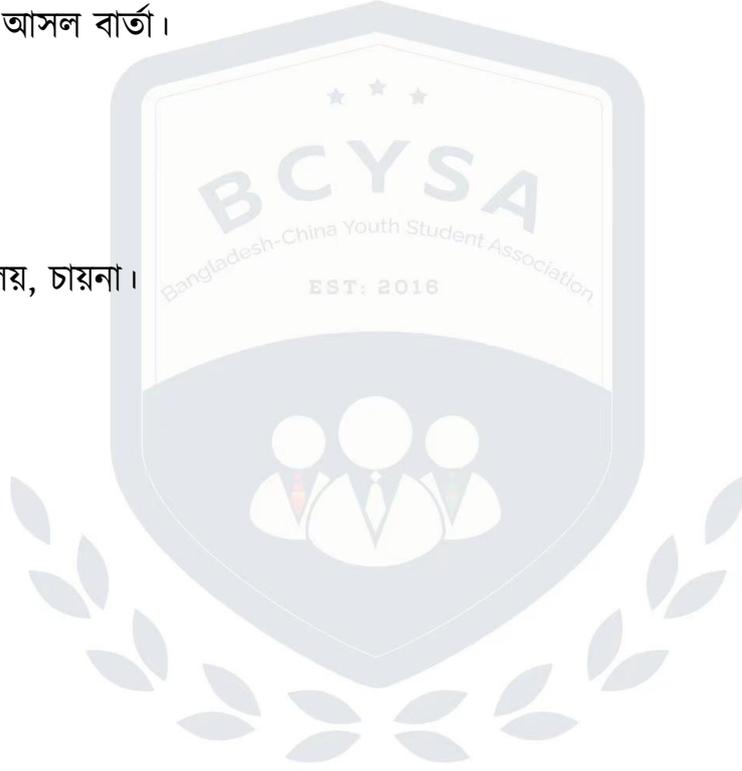
উপস্থাপন করতে হয়। আপনি শুধু যাত্রা করছেন না, বরং একটি সাংস্কৃতিক সেতু পার হচ্ছেন।

চপস্টিকটা একটু সোজা ধরুন, উপহারটা দু'হাতে দিন, আর কেউ “না” না বললেও না বললে, সেটা শুনতে শিখুন। এটাই চাইনিজ এটিকেট—নীরব ভাষার মতো এক জগৎ, যেখানে আচরণই আসল বার্তা।

নাঈমা আক্তার,
চিংহুয়া বিশ্ববিদ্যালয়, চায়না।

আপনি জানেন কি?

চীনে কেউ যদি হাঁচি দেয়, সাধারণত কেউ “Bless you” বা কিছুই বলেন না। কারণ তারা মনে করে, হাঁচি দেওয়া পুরোপুরি প্রাকৃতিক—তা নিয়ে মন্তব্য করা অপ্রয়োজনীয়!



একটি অধ্যায়ের শেষ, নতুন স্বপ্নের শুরু



একজন মানুষের জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময়গুলোর একটি হলো—যখন সে কৈশোর পেরিয়ে তরুণ বয়সে পা রাখে, ২০-এর কোঠায় পৌঁছায়। আমরাও তখনই জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করি—এমবিবিএস।

বেশিরভাগের মতো আমাদেরও তখন বাসার বাইরে থাকার, একা চলার, নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়ার অভিজ্ঞতা ছিল না। আর যখন সেই যাত্রা শুরু হয় সুদূর চীনের মতো একটি ভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি ও খাদ্যাভ্যাসের দেশে, তখন সেই অভিজ্ঞতা যেন মেডিকেল এন্ট্রান্স পরীক্ষার থেকেও কঠিন মনে হয়। কোনো প্রস্তুতির সুযোগ ছিল না—শুধু ইউটিউব, ফেসবুক ঘেঁটে যতটুকু

জানা সম্ভব, সেটুকুই হাতিয়ার করে একা পাড়ি দিয়েছিলাম এই অজানা পথ।

আজ সেই দীর্ঘ পথচলার একটি মাইলফলকে পৌঁছেছি—আমাদের গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন হয়েছে। আমরা সেই ব্যাচ, যারা কোভিড-১৯ মহামারির



সম্পর্কের নতুন দিগন্ত: বাংলাদেশ-চায়নার নব মেরু করণ



মাঝখানে পড়েছিলাম। বিশ্ব থমকে গিয়েছিল, আমরাও চিন্তিত ছিলাম আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে। কিন্তু



আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে আমরা সুস্থ থেকেছি, লড়েছি, অপেক্ষা করেছি—আজ আমরা গর্বিতভাবে গ্র্যাজুয়েট। এখন আমরা হাতে নিয়েছি সার্টিফিকেট, চোখে রেখেছি স্বপ্ন, আর হৃদয়ে জমা রেখেছি হাজারো স্মৃতি। মানুষ হয়তো নিজে নিজে আকাশে উড়তে পারে না, কিন্তু কেউ যদি লাফ দিয়ে হাওয়ায় থাকা মুহূর্তটা ক্যামেরাবন্দী করে— তাতেই তো খুশি হওয়া যায়। আর নিজের খুশিই তো সবচেয়ে বড় খুশি। তাই নয় কি?

বি. ড্র.: আমি এবার গ্র্যাজুয়েট করিনি, কিন্তু এই কথাগুলো আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের আজ গ্র্যাজুয়েট হওয়া জুনিয়রদের সাথে কথা বলে বুঝতে পেরেছি। তাই তাঁদের হয়ে লিখলাম।



ডা. তৌকির হোসেন

এমবিবিএস, এমআরসিইএম-ইউকে (প্রাইমারি)

এমডি-রেসিডেন্ট, ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন

হারবিন মেডিকেল ইউনিভার্সিটি, হারবিন, হেইলংজিয়াং

Racing Across Traditions: The Jinji Lake Dragon Boat Festival



The Suzhou Jinji Lake International Dragon Boat Race is not just a sporting competition; it is a celebration of culture, teamwork, and shared heritage that brings together people from across the globe.

This year's Dragon Boat Race was held on May 31, 2025. This event welcomed both local teams and international participants from countries all over the world. The result was a lively, multicultural atmosphere where diverse traditions merged in the spirit of unity. From 8:00 AM to 12:00 PM, the lake came alive as long, ornately decorated

dragon boats sliced through the water, guided by the synchronized paddling of determined rowers. The steady beat of drums echoed across the lake, accompanied by the cheers of enthusiastic crowds lining the shores.

Since 2010, the festival has been held annually on the Dragon Boat Festival Day and has grown steadily as a highlight of Suzhou's cultural calendar. In recent editions, 66 teams have competed, including approximately 172 international participants from around 15 countries and regions, such as France, Germany, the United States, Russia,

Brazil, the UK, Switzerland, and others. The competition features races of approximately 300 meters, held in both 12-paddler and 22-paddler boat categories.



Each year, over 30,000 spectators flock to Jinji Lake to watch the action in person. In addition, the event draws millions of online viewers, with 10 million tuning in via live stream in recent years. Along the shoreline, cultural and culinary stalls offer food and performances from different countries. Children enjoy games, while visitors explore traditional handicrafts, enriching the traditions with a modern, family-friendly experience.

Dragon boat racing dates back more than 2,000 years and is deeply



tied to the Duanwu Festival, also known as the Dragon Boat Festival. The festival commemorates Qu Yuan,

a revered poet and statesman of ancient China. Legend says that after he drowned himself in protest against political corruption, villagers raced their boats to save him and scattered rice into the river to protect his body from fish. Over time, these acts evolved into two enduring traditions: dragon boat racing and the preparation of zongzi—sticky rice dumplings wrapped in bamboo leaves.



The Suzhou race embodies more than athleticism; it's a bridge between the past and present. Jinji Lake's connection to this ancient tradition highlights how heritage adapts to modern urban life. The festival emphasizes unity, cultural pride, and shared celebration. International participation reinforces Suzhou's role as a cosmopolitan hub and demonstrates how local traditions can foster global connections.

Dragon boat races are also celebrated worldwide. For example: Vancouver, Canada, hosts the Canadian International Dragon Boat Festival, North America's largest. It features over 200 crews, ethnically

themed food stalls, cultural performances, and children's programming, celebrating both competition and community harmony.

Toronto's International Dragon Boat Race Festival, held since 1989, annually attracts more than 5,000 athletes, over 80 local artists, and 65,000 visitors to Centre Island for racing and a cultural showcase.



In Eastern China, the Qintong Boat Festival in Jiangyan, Jiangsu is also well known. Held during Qingming, it features dragon boat races, theatrical performances, and attracts around 300,000 visitors annually.

These global and regional festivals share a spirit of cultural exchange and communal celebration. They reinforce the Dragon Boat Festival's relevance across both time and geography.

Beyond its sporting aspect, the Jinji Lake Dragon Boat Race is an immersive cultural experience. It offers visitors a glimpse into one of China's most cherished traditions while also showcasing Suzhou's charm as a modern city. With the

city's skyline reflected in the shimmering lake and boats gliding gracefully across the water, it feels like a perfect blend of history, nature, and progress.

This event reminds us that tradition has no boundaries. Whether you are a



competitor, a spectator, or a photographer capturing the vibrant moments, the Jinji Lake Dragon Boat Festival invites everyone to be part of a timeless story—one where heritage meets harmony and sport becomes celebration.



Raoha Bin Mejba
Office Secretary, BCYSA (2024-25)
Master's in Software Engineering,
Suzhou Institute for Advanced Research,
University of Science and Technology of China
(USTC)

চীনের থ্রি গর্জেস ড্যাম ও চিং হে জলাধার প্রকল্প পরিদর্শন: এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা



সম্প্রতি, আমি চীনে একটি অসাধারণ অভিজ্ঞতার সাক্ষী হয়েছিলাম, যখন চীনের থ্রি গর্জেস ড্যাম এবং চিং হে জলাধার প্রকল্প পরিদর্শন করার সুযোগ পেয়েছিলাম। এটি ছিল ২০২৫ সালের আন্তর্জাতিক গ্রীষ্মকালীন স্কুলের একটি অংশ, যা চীন থ্রি গর্জেস বিশ্ববিদ্যালয়-এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই অভিজ্ঞতা ছিল জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যা আমাকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করেছে।

থ্রি গর্জেস ড্যাম: প্রযুক্তি ও শক্তির অন্যতম চমকঃ থ্রি গর্জেস ড্যাম, যেটি বিশ্বের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত, এর পরিদর্শন ছিল আমার জন্য এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। এটি এমন একটি প্রকল্প যা শুধু চীনের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাকে বিপুলভাবে শক্তিশালী করেনি, বরং বিশ্বব্যাপী জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলোর একটি মাইলফলক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। আমি সেখানে গিয়ে দেখেছি কীভাবে বিশাল টারবাইনগুলো নদী থেকে উৎপন্ন শক্তিকে

বিদ্যুতে রূপান্তরিত করে। টারবাইন রুমে প্রবেশের পর, আমি তার আধুনিক প্রযুক্তি এবং বিশাল পরিসরের যন্ত্রপাতি দেখে অভিভূত হয়েছি। এই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আমি বুঝতে পারলাম কীভাবে একত্রিতভাবে কাজ করা সম্ভব হয় এবং কেন থ্রি গর্জেস ড্যাম বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র।



ড্যামের মাধ্যমে চীন শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদনেই এগিয়ে যাচ্ছে না, বরং বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং নদীর নৌপরিবহন ব্যবস্থাও উন্নত হচ্ছে। এমনকি, পরিবেশগতভাবে আরও সতর্ক থেকে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে এগিয়ে নিতে এই প্রকল্পটি দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মিউজিয়াম: প্রকল্পের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্যঃ পরিদর্শনের পর আমি মিউজিয়ামটিও দেখতে পাই, যা থ্রি গর্জেস ড্যাম এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রকল্পের ইতিহাসকে উপস্থাপন করে। এখানে প্রদর্শিত তথ্য ও প্রদর্শনী আমাকে প্রকল্পটির দীর্ঘ এবং

চ্যালেঞ্জপূর্ণ নির্মাণ ইতিহাস সম্পর্কে জানায়। প্রকল্পটি প্রথম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কী কী প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে এবং নির্মাণের সময় কতটা পরিশ্রম করা হয়েছে, তা এককথায় শিক্ষণীয়। বিশেষত, মিউজিয়ামের পরিবেশগত পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা এবং মাছের প্রজনন কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়টি প্রকল্পটির পরিবেশগত দায়িত্বের প্রতি আরও সজাগ করে তোলে।



চিং হে জলাধার: সেচ ব্যবস্থার আধুনিকতাঃ থ্রি গর্জেস ড্যামের পর, আমি চিং হে জলাধার প্রকল্প পরিদর্শন করি, যা মূলত সেচ এবং পানি সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি শুধুমাত্র কৃষির উন্নতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং আঞ্চলিক উন্নয়ন এবং পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতেও সহায়তা করছে। চিং হে জলাধারের মাধ্যমে আমি বুঝতে পেরেছি যে, সঠিকভাবে জলাধার ব্যবস্থাপনা এবং পানির সংরক্ষণ

কীভাবে একটি অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। এই জলাধারটির কার্যকারিতা পরিদর্শন করে, আমার মনে হয়েছে যে, জলসম্পদ ব্যবস্থাপনা একেবারে নতুন মাত্রায় পৌঁছেছে, যা কৃষি, পরিবহন এবং আঞ্চলিক উন্নয়নকে একসঙ্গে মেলে।

জলবিদ্যুৎ প্রকৌশলে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিঃ এই প্রকল্পগুলো পরিদর্শন করার মাধ্যমে আমি জলবিদ্যুৎ প্রকৌশল এবং পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি পেয়েছি। বিশেষত, থ্রি গর্জেস ড্যামের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং পরিবেশগত দায়িত্বের মধ্যে একটি ভারসাম্য তৈরি করার প্রচেষ্টা আমাকে মুগ্ধ করেছে। এর পাশাপাশি, চিং হে জলাধারের সেচ ব্যবস্থা এবং পানির সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। আমি নিশ্চিত, এসব প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা আমাদের পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিশাল পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবো।

ভবিষ্যৎ প্রেক্ষাপটে অর্জিত অভিজ্ঞতাঃ এই অভিজ্ঞতা শুধুমাত্র আমাকে জলবিদ্যুৎ প্রকৌশল এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেনি, বরং এটি আমাকে ভবিষ্যতের গবেষণা এবং উন্নয়ন কার্যক্রমে আরও ভালোভাবে প্রস্তুত হতে সাহায্য করেছে। থ্রি গর্জেস ড্যাম এবং চিং হে জলাধারের মতো প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে আমি শিখেছি কীভাবে পানি সম্পদ

ব্যবস্থাপনার উন্নতি এবং টেকসই শক্তি উৎপাদন বিশ্বের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

এই অভিজ্ঞতা চীন থ্রি গর্জেস বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজিত গ্রীষ্মকালীন স্কুলের অংশ হিসেবে আমার জন্য একটি অমূল্য শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা ছিল, যা আমাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমৃদ্ধ করেছে এবং ভবিষ্যতে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের উন্নয়নে আমার অবদান রাখার জন্য প্রস্তুত করেছে।



মোঃ আব্দুল্লাহ আল গালিব
বিসাইসিএ ক্যাম্পাস অ্যাসোসিয়েট, চায়না থ্রি
গর্জেস ইউনিভার্সিটি

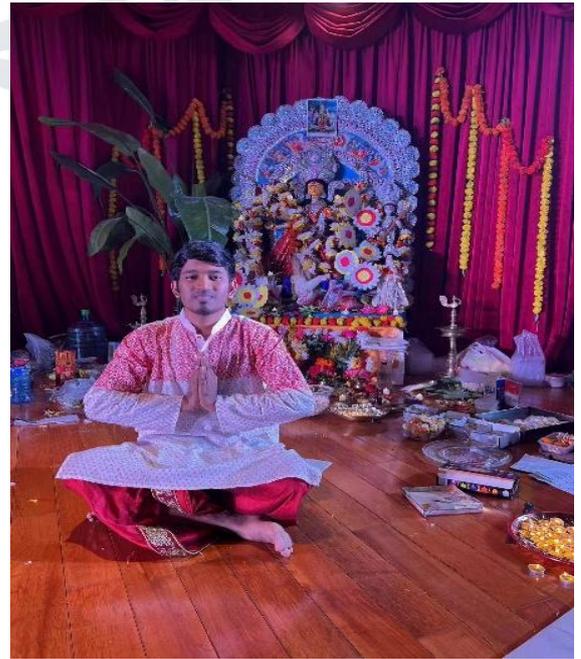
চীনের রাজধানীর শারদীয়া দুর্গাপূজা



দুর্গাপূজা বাঙালি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। ভারতীয় উপমহাদেশসহ বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে সনাতন ধর্মের এই প্রধান উৎসবটি মহাসমারোহে উদযাপিত হয়। তেমনই চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে বাংলাদেশি ও ভারতীয় সনাতন ধর্মাবলম্বীরা যৌথভাবে প্রতি বছর ভারতীয় দূতাবাসে দুর্গাপূজার আয়োজন করে থাকেন।

হয়। সেখানে যোগাযোগ করে পূজায় অংশ নিয়েছিলাম। হঠাৎ করে এত বাঙালিকে একসঙ্গে দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ি।

২০১৯ সালে চীনে আসার পর থেকেই বাংলাদেশের দুর্গাপূজাকে খুব মিস করতে শুরু করি। এরপর বাঙালিদের বিভিন্ন উইচ্যাট গ্রুপ থেকে খবর নিতে থাকি। অবশেষে একজন বাঙালি-ভারতীয়র মাধ্যমে জানতে পারি, ভারতীয় দূতাবাসে দুর্গাপূজা



২০২০ ও ২০২১ সালে যথারীতি পূজায়

অংশগ্রহণ করি। এবার পূজা আয়োজক কমিটি থেকে আমাকে ছোটখাটো কিছু দায়িত্ব দেওয়া হয়।

কিন্তু ২০২২ সালে প্রধান পুরোহিত ভারতে চলে যান। যেহেতু তিনি দূতবাসের একজন কর্মকর্তা ছিলেন, তাই নির্দিষ্ট সময় পর পর উনাদের অন্য দেশে স্থানান্তরিত হতে হয়। সেই সময় কোভিডের প্রকোপ থাকার কারণে চীনের বাইরে থেকে পুরোহিতও নিয়ে আসা যাচ্ছিল না। সবশেষে উপায় না পেয়ে দূতবাস থেকে আমাকে পূজার দায়িত্ব দেওয়া হলো। যেহেতু আমি আগে কোনোদিন দুর্গাপূজা করিনি, তাই একটু নার্ভাস ছিলাম। যাইহোক, কয়েক সপ্তাহ পূজার নিয়মকানুন সম্পর্কে ভালোভাবে স্টাডি করি। এছাড়াও পূজার সময় একজন ব্রাহ্মণ অনলাইনে আমাকে সাহায্য করেছিলেন। এভাবে ২০২২ ও ২০২৩ সালের পূজা নিজের হাতে সম্পন্ন করি।

পূজার দিন খুব সকালে কমিটির সবাই চলে আসেন এবং পূজার আয়োজন শুরু হয়। এরপর একে একে বিভিন্ন দেশের অতিথিবৃন্দ আসতে থাকেন। পূজার শেষে সবাই একসাথে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে থাকেন। তবে প্রতি বছরের বিশেষ আকর্ষণ থাকে কুমারী পূজা, যেখানে ৫-১০ বছরের একটি

মেয়েকে দেবী রূপে পূজা করা হয়। এটি নারীশক্তির প্রতি সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শনেরও একটি অংশ। এরপর ছোটদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতা হয়। দুপুরে নানা ধরনের বাঙালি খাবার পরিবেশন করা হয়।

সন্ধ্যার সাথে সাথে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও দূতবাসের কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এরপর সন্ধ্যা আরতি ও সর্বশেষ পুষ্পাঞ্জলি পর্ব শুরু হয়। প্রধান অতিথির শুভেচ্ছা বক্তব্যের পর শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উক্ত অনুষ্ঠানে চীন, বাংলাদেশ ও ভারতের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগীত ও নৃত্যশিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান শেষে হরেক রকমের বাঙালি খাবার আর মিষ্টান্ন দিয়ে নৈশভোজের আয়োজন করা হয়।

চীনের রাজধানীতে এরকম আয়োজন বাংলাদেশ, ভারত ও চীনসহ বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করে।



অর্জুন

চিংছ্যা বিশ্ববিদ্যালয়, চায়না।

চীনের বিশ্ব বিখ্যাত থ্রি জর্জেস বাঁধ ও সাংহাই শহর আলোকিত হওয়ার গল্প



চীনের শক্তিশালী ইয়াংজি নদীর ওপারে বিস্তৃত থ্রি জর্জেস বাঁধ শুধু কংক্রিটের একটি প্রাচীর নয়; এটি মানবজাতির অন্যতম উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং বিস্ময়কর প্রকৌশল প্রকল্প। এটি চীনের প্রযুক্তিগত দক্ষতা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার দৃঢ় সংকল্পের এক শক্তিশালী প্রতীক হিসেবে বিশ্বের বুকে দাঁড়িয়ে আছে।

- অবস্থান: হুবেই প্রদেশ, চীন
- নদী: ইয়াংজি নদী (এশিয়ার দীর্ঘতম নদী)
- প্রকল্পের দৈর্ঘ্য: ২.৩ কিলোমিটার (১.৪ মাইল)
- উচ্চতা: ১৮১ মিটার (৫৯৪ ফুট)

- বিদ্যুৎ ক্ষমতা: ৩৪টি টারবাইন থেকে ২২,৫০০ মেগাওয়াট (বিশ্বের বৃহত্তম বিদ্যুৎকেন্দ্র)
- নির্মাণ: ১৯৯৪-২০০৬ (২০১২ সালে সম্পূর্ণরূপে কার্যকর)
- ব্যয়: প্রায় ৩৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার

বাঁধটি মূলত তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি করা হয়েছিল, যার প্রতিটিই সফলতা অর্জন করেছে:

১. বন্যা নিয়ন্ত্রণ: ইয়াংজি নদী ঐতিহাসিকভাবে ভয়াবহ বন্যার ঝুঁকিতে ছিল, যা শতাব্দী ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। বাঁধের বিশাল জলাধার প্রচুর পরিমাণে পানি ধারণ করতে পারে, যা লক্ষ

সম্পর্কের নতুন দিগন্ত: বাংলাদেশ-চায়নার নব মেরুকরণ



লক্ষ মানুষ এবং ভাটির দিকে বিস্তৃত
কৃষিজমিকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করে।

গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন এবং বায়ু দূষণ
কমাতে সাহায্য করেছে।



২. বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন: এটি বাঁধের প্রধান
ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বিশ্বের বৃহত্তম
বিদ্যুৎকেন্দ্র হিসেবে, এটি প্রচুর পরিমাণে
নবায়নযোগ্য জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করে, যা
চীনের শিল্পনগরী সাংহাইয়ের মতো বড়

৩. উন্নত নেভিগেশন: বাঁধটি ইয়াংজি নদীকে
গভীর ও নির্ভরযোগ্য জলপথে রূপান্তরিত
করেছে। এর ফলে বৃহৎ পণ্যবাহী
জাহাজগুলো চীনের অনেক অভ্যন্তরীণ
নৌপথে যাতায়াত করতে পারে, যা আঞ্চলিক



শহরগুলোতে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য যথেষ্ট।
এ ধরনের প্রকল্প কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎ
উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করেছে, যা

বাণিজ্য বৃদ্ধি করেছে এবং পণ্য পরিবহনের
খরচ কমিয়েছে।



মোহাম্মদ আদিল,
ফাইন্যান্স সেক্রেটারি,
বিসিওয়াইএসএ ২৪-২৫ সেশন

অবিশ্বাস্য তিব্বত ও কৈলাসপর্বত: পৃথিবীর ছাদে এক অদম্য আধ্যাত্মিক যাত্রা



বেইজিং থেকে যাত্রা শুরু করে লাসার বিমানবন্দরের বাইরে পা রাখতেই এক ঝলক ঠান্ডা, খাঁটি বাতাস আমার গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসে ভরে গেল। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪০০০ মিটার উঁচুতে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল যেন পৃথিবীর ছাদে পৌঁছে গেছি আমি। আকাশ ছিল নীলের চেয়েও নীল, আর সূর্যের আলোয় চারপাশের পাহাড়গুলো যেন সোনায় মোড়া।

আমার গাইড, লাবসাম, একটি উজ্জ্বল লাল রঙের চাদর জড়িয়ে হাসিমুখে এগিয়ে

এলেন। তাঁর কণ্ঠে ছিল অদ্ভুত এক সুর, "তাশি দেলেক!" যার মানে 'স্বাগতম'। লাবসামের গাড়িতে করে লাসা শহরের দিকে যাওয়ার পথটাই ছিল এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। রাস্তার দু'ধারে উড়ছিল প্রার্থনার পতাকা – নীল, সাদা, লাল, সবুজ, আর হলুদ। এই পাঁচটি রং আকাশ, বাতাস, আগুন, জল আর মাটির প্রতীক। এই পতাকাগুলোই যেন প্রকৃতির সাথে তিব্বতিদের আত্মার সংযোগ ঘটায়।

পরের দিন সকালে আমি ধর্মচক্র ঘোরার জন্য পৌঁছালাম। জোকাং মন্দিরের বাইরে হাজার হাজার ভক্ত তাদের প্রার্থনার চাকতি ঘোরাচ্ছেন। কণ্ঠে 'ওম মণি পদ্মে হুম' মন্ত্রের গুঞ্জন। আমি স্থানীয় এক বৃদ্ধার সাথে ঘণ্টার আওয়াজের তালে তালে ধর্মচক্র ঘুরিয়েছি। তাঁর চোখে ছিল এক গভীর শান্তি, যা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

তিব্বতের সবচেয়ে চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা ছিল পোতলা প্রাসাদ দেখতে যাওয়া। লাল আর সাদা রঙের এই বিশাল প্রাসাদটি এক পর্বতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, যেন স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলেও, উপরে পৌঁছে যে দৃশ্য চোখের সামনে দৃশ্যমান হলো, তার বিনিময়ে সমস্ত কষ্টই সার্থক মনে হলো। শতাব্দী প্রাচীন দেয়াল, সোনার ছাদ, আর অসংখ্য স্তূপ – সব মিলিয়ে এটি শুধু প্রাসাদ নয়, এটি তিব্বতিদের আত্মার প্রতীক। তবে দালাইলামার এই প্রাসাদে মহাদেব শিবের মূর্তি দেখে বিস্মিত হলাম, কারণ দালাইলামা বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ছিলেন। পরে লাবসাম বললো, তিব্বতির মহাদেবকে এখানে মহাকাল রূপে পূজা করে এবং তাঁকে তিব্বতের রক্ষক বলে মনে করে। তাই কৈলাস তিব্বতিদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

লাসায় থাকাকালীন, আমি বাংলার মহান পণ্ডিত ও সাধক আতীশ দীপঙ্কর-এর

স্মৃতিবিজড়িত একটি প্রার্থনা গৃহে যাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম। একাদশ শতাব্দীতে তিনি তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম পুনরুজ্জীবিত করতে এসেছিলেন। সেই ছোট্ট, শান্ত গৃহটি ছিল ইতিহাসে ডুবে থাকার মতো একটি অভিজ্ঞতা। ধূপের সুগন্ধ বাতাসে ভাসছিল, আর দেয়ালে আতীশ দীপঙ্করের পাণ্ডুলিপি এবং ছবি প্রদর্শিত হচ্ছিল। একজন বাঙালি হিসেবে, আমাদের একটি অংশ খুঁজে পাওয়া খুব গর্বের এবং আবেগঘন ছিল। আমি মনে মনে এই মহান সাধকের জন্য কৃতজ্ঞতা জানালাম।



পরের দিন আমরা গিয়েছিলাম একটি গ্রামে। সেখানে এক তিব্বতি পরিবার তাদের ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি চা আমাদের খেতে দিল। চা প্রথমে একটু অদ্ভুত লাগলেও, পরে ভালোই লাগছিল। তাদের সরলতা আর আতিথেয়তা আমাকে গভীরভাবে আনন্দিত করেছিল।

তিব্বতের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল ইয়ামড্রোক লেক (Yamdruk Lake) দেখতে যাওয়ার পথে ৫,০০০ মিটার উঁচু

কাম্বা লা পাস (Kamba La Pass) পার হওয়া। বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ কম, মাথা ঘুরছিল। কিন্তু যখন নীল ইয়ামড্রোক লেক, যাকে স্থানীয়রা 'turquoise earring' বলে, তা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল, তখন সব কষ্ট ভুলে গিয়েছিলাম। প্রকৃতির এই অকৃপণ সৌন্দর্য দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম।

শিখর জয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে, তাদের মুখমণ্ডলে উদ্বেগ এবং উত্তেজনার মিশ্রণ।



এরপর পৌঁছে গেলাম এভারেস্ট বেস ক্যাম্প। বাতাস ছিল হাড় কাঁপানো ঠান্ডা, আর অক্সিজেন ছিল খুবই স্বল্প। প্রায় ৫,২০০ মিটার উচ্চতায়, প্রতিটি পদক্ষেপই একটি বিজয়ের মতো মনে হচ্ছিল। আর তখনই হঠাৎ দেখা গেল সেই পরাক্রমশালী মাউন্ট এভারেস্ট, যাকে তিব্বতীয় ভাষায় বলে "চোমোলাংমা" - অর্থাৎ "বিশ্বের মাতা দেবী"। সেই দৃশ্য ছিল এতই মহিমাম্বিত যে আমি আক্ষরিক অর্থেই নিঃশ্বাসরুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল পৃথিবীর সর্বোচ্চ বিন্দু, যার বরফাবৃত চূড়া যেন আকাশকেই স্পর্শ করছিল।

আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেবল সেখানে বসে কাটালাম, হিমালয়ের মহিমা উপলব্ধি করলাম। আমি ভাবলাম এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমরা কত ছোট, অথচ আমাদের স্বপ্নগুলো কত বড় হতে পারে। আমি নিজেকে তুচ্ছ এবং একই সাথে অবিশ্বাস্য রকমের শক্তিশালী মনে করতে লাগলাম।

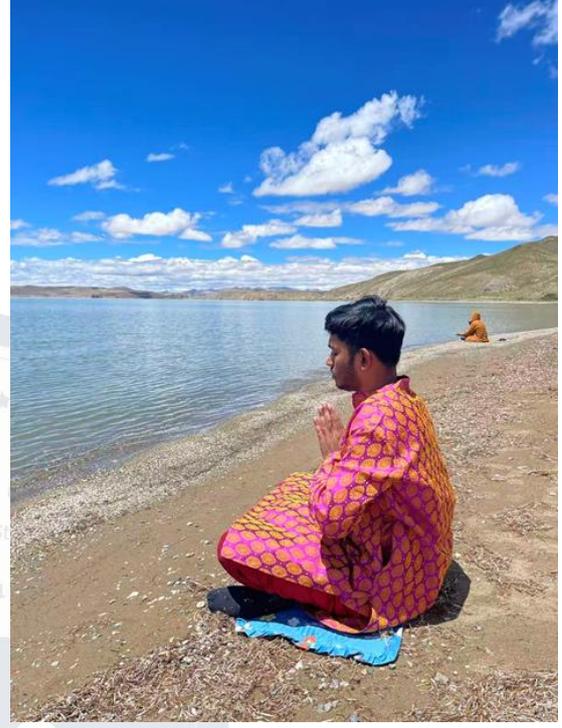
এভারেস্ট বেস ক্যাম্প নিজেই ছিল একটি কর্মব্যস্ত তাঁবু শহর - নানা রঙের তাঁবু, আন্তর্জাতিক পর্বতারোহীদের উত্তেজনাপূর্ণ কণ্ঠস্বর, আর সর্বত্রই তাদের দৃঢ় সংকল্প এবং স্বপ্নের ছোঁয়া। আমি দেখলাম দলগুলো

রাতটি বেস ক্যাম্পে কাটালাম, যেখানে তাপমাত্রা মাইনাস ১৫ ডিগ্রিতে নেমে গিয়েছিল। খুব ঠান্ডা ছিল, কিন্তু অভিজ্ঞতা ছিল অমূল্য - আমি যত পরিষ্কার রাতের আকাশ দেখেছি, তার নিচে তারাগুলো যেন ছুঁতে পারার মতোই কাছে মনে হচ্ছিল।

পরের দিন ফেরার সময়, আমি শেষবারের মতো বিদায় দিলাম চোমোলাংমাকে। এভারেস্ট শুধু একটি পর্বত নয়, এটি নতুন সম্ভাবনার প্রতীক - যে কোনো স্বপ্নই বড় নয়, কোনো পর্বত আরোহণের জন্য উচ্চ নয়।

তারপর আরো একটি রোড ট্রিপ শুরু হলো। প্রথম দিন আমরা বিশাল, উন্মুক্ত প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করলাম, যেখানে ইয়াক (তিব্বতি মহিষ) চরছিল এবং যাযাবরদের তাঁবু ছিল। দ্বিতীয় দিনে, হঠাৎই দিগন্তে দেখা গেল মানস সরোবর হৃদের স্ফটিকের মতো নীল জলরাশি। এটি পৃথিবীর সর্বোচ্চ মিষ্টি জলের হৃদগুলোর মধ্যে একটি এবং হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ধর্মের জন্য সর্বাঙ্গীণ পবিত্র হৃদ হিসেবে বিবেচিত। এর জল ছিল এত স্বচ্ছ যে আমি আমার নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পাচ্ছিলাম, মনে হচ্ছিল যেন আকাশ এবং পৃথিবীর মিলনস্থল।

করি। এছাড়া আমরা মানস সরোবরের অপর পাশে অবস্থিত বিষাক্ত হৃদও ভ্রমণ করলাম।



এরপর শুরু হলো কৈলাস যাত্রা। চিরতুষারে আবৃত পিরামিড আকৃতির এই মহিমান্বিত শিখরটি তার সমস্ত মহিমা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল—যেটি হিন্দুধর্ম মতে ভগবান শিবের বাসস্থান এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। সেই দূরত্ব থেকে, এটি দেখতে শান্ত কিন্তু শক্তিশালী। কিন্তু আমার লক্ষ্য ছিল শুধু দর্শন নয়, আমি ছিলাম পরিক্রমা করার দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।

তারপর আমাদের গ্রুপের সবাই মিলে মানস সরোবরের পাড়ে পূজা করলাম, যেখানে আমি পুরো পূজাটির পৌরহিত্য

দারচেন শহর থেকে যাত্রা শুরু করলাম। পথটি উঁচুনিচু ছিল এবং উচ্চতার কারণে আমার শ্বাসকষ্ট হতে শুরু করেছিল। তীর্থযাত্রীদের, বৃদ্ধ এবং যুবক, "ওম নমঃ শিবায়" মন্ত্র জপতে জপতে এগিয়ে যেতে দেখে, আমি এগিয়ে যেতে থাকলাম। আমি

তিব্বতি তীর্থযাত্রীদের দেখলাম যারা প্রতিটি পদক্ষেপে নতজানু হয়ে প্রণাম করছিল— তাদের ভক্তি ছিল একইসাথে বিনম্র এবং অনুপ্রেরণাদায়ক।

আমরা দিনটি শেষ করলাম দেরাপুক মঠে, যা ঠিক কৈলাসের উত্তর মুখের বিপরীতে অবস্থিত। সূর্যাস্তের সময় পর্বতটি সোনালি হয়ে উঠতে দেখার দৃশ্য আমি কখনও ভুলতে পারব না। রাতে ছিল ভরা পূর্ণিমা, যা কৈলাসকে আরও সুন্দর করে তুলেছে। পরের দিন সকালে ভয়ে ভয়ে উঠে গেলাম কৈলাসের পাদদেশে, যা বেস ৫৪০০ মিটার থেকে অনেক উপরে ছিল এবং সঙ্গে ছিল শ্বাস নেওয়ার সমস্যা। তারপরও মনে ভক্তি ও পূজার সামগ্রী নিয়ে একাই উঠে গেলাম এবং সর্বোচ্চ স্থানে বসে চণ্ডীপাঠ ও পূজা সম্পন্ন করলাম।

কৈলাস শুধু একটি পর্বত নয়, এক রহস্যময় শক্তিশালী স্থান। এরপর আমাদের ফেরার পালা। ট্রেকিং শেষ করে, দারচেন শহর থেকে লাসা, এরপর বিমানে করে বেইজিং চলে এলাম। এভাবে একটি আধ্যাত্মিক যাত্রার সমাপ্তি হলো।

তিব্বতের নীল আকাশ, উড়ন্ত প্রার্থনার পতাকা, মানস সরোবরের পবিত্র জল,

কৈলাসের চূড়া, এবং ভক্তদের নিঃশর্ত বিশ্বাস—এইগুলি চিরদিন আমার আত্মার একটি অংশ হয়ে থাকবে।

তুচিচৈ, 谢谢 – ধন্যবাদ, তিব্বত।
তোমার আধ্যাত্মিকতায় আমি চিরদিনের জন্য পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছি।



অর্জুন
চিংহুয়া বিশ্ববিদ্যালয়, চায়না।

গুইজো থেকে ছয়াংশান: আমার বিশ্ববিদ্যালয় পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা

বরাবরই উচ্চশিক্ষার ইচ্ছা ছিলো, সেটেল হওয়ার থেকেও বেশি ঘুরাঘুরি করার জন্য বাইরে আসার আগ্রহ বেশি ছিলো। ভেবেছিলাম এইচএসসি শেষ করে সেভাবেই প্রস্তুতি নেবো, কিন্তু আম্মুর জোরাজুরিতে অ্যাডমিশন পরীক্ষার জন্য পড়তে হয়, কিন্তু আমি ফেল করি—আমি পারিনি। এটা নিয়ে আফসোস নেই। এরপর ঢাকার একটা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি নিই, কিন্তু বছর যেতে না যেতেই আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। এরপর আব্বু রাজি হন, আমি ঢাকা থেকে বাসায় চলে আসি, এসে আইইএলটিএসের প্রস্তুতি নিই, এবং ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর ইনটেকে অ্যাপ্লিকেশন করি। হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট, চাইনিজ ল্যাংগুয়েজ, নার্সিংসহ আরও কয়েকটিতে অ্যাপ্লিকেশন করি। শেষমেশ আবারও আম্মুর সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে নার্সিং নিই এবং চীনের গুইজো প্রভিন্সের গুইজো ইউনিভার্সিটিতে আসি।

স্টুডেন্ট আমি খারাপ না, আবার খুব ভালোও না। পড়ালেখা ঠিকঠাক করলে মোটামুটি ভালোই করি। পড়াশোনা ঠিকঠাকই চলছিলো, কিন্তু ১ম সেমিস্টার শেষ হওয়ার আগেই আমার অসুস্থতা আর মাথার পোকা জেগে উঠে—মেডিকেল সেক্টর আমার জন্য নয়। তখনই সিদ্ধান্ত নিই মেজর

পরিবর্তন করবো। কিন্তু গুইজোতে আমার পছন্দের মেজর নেই। আর ল্যাংগুয়েজ করার জন্য সেই ইনটেকে আমি অ্যাপ্লিকেশনও করিনি।

এরপর শুরু করি কোথায় অ্যাপ্লিকেশন করা যায়, কী স্কলারশিপ আছে। এরপর জানতে পারি, গতবছর দেশে না গিয়েই চীনের মধ্যেই কিছু শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় পরিবর্তন করেছে। যদিও সবাইকে অনুমতি দেয় না, নির্ভর করে শিক্ষকের ওপর—তিনি কী করবেন না করবেন। ক্লাসের সব শিক্ষকের সাথেই আমার ভালো সম্পর্ক ছিলো, তাই আমি কথা বলে তথ্য নেওয়া শুরু করি। হেড টিচার, ডিপার্টমেন্ট ডিন, অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার—সবার সাথেই পরামর্শ করি। আর বিসিওয়াইএসএর বড় ভাইয়ারা, যাদের সাথে নিয়মিত কথা হতো, সবার সাথেই বিশ্ববিদ্যালয় পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করি। যে যতটুকু জানতো সব বিষয়ে আমাকে জানায়। এরপর আমি হেড টিচারের সাথে কথা বলি।

যেহেতু আমি দেশে ফিরবো না, এজন্য চেষ্টা করছিলাম স্টে ভিসা নেওয়ার। আমার হেড টিচার জানান, যদি ইমিগ্রেশন থেকে অনুমতি দেয় তবে তিনি রেকমেন্ডেশন পেপার দিতে কোনো সমস্যা দেখবেন না।

যেহেতু আমার চাইনিজ ভালো না, সব কথা ট্রান্সলেট করে বারবার বলতে হয়—এটা বড় সমস্যা। এজন্য আমি সবকিছু লিখে ইংরেজি থেকে চাইনিজে ট্রান্সলেট করে প্রিন্ট করে নিয়ে যেতাম।

এরপর আমি আর আমার বন্ধু আরমান ভিসা অফিসে যাই, অফিসারের সাথে কথা বলি। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রেকমেন্ডেশন পেপার দিলে ভিসা অ্যাপ্লিকেশন করলে তারা ভিসা দেবেন। এরপর ভিসা অফিসারের কথা টিচারকে জানাই, যথারীতি সব কিছু করি, এবং ভিসা নিই। কিন্তু সমস্যা হলো—বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে এক মাসের ভিসা দেবে, কিন্তু আমার প্রয়োজন ছিলো দুই মাসের।

পরবর্তীতে আমি আমার নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে কথা বলি। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজি হন। পরবর্তীতে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একসাথে কথা বলতে রাজি করাই। তারা কথা বলেন। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় তাদের শহরের ইমিগ্রেশন অফিসে যোগাযোগ করে ভিসার ব্যবস্থা করেন।

যে গুইজোকে আমি কখনো ঠিকভাবে চিনে উঠতে পারিনি, তাকে ছাড়তে হলো। সেখান থেকে ছুয়াংশান পর্যন্ত আসা আমার জন্য এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। কিভাবে যাবো, কিসে যাবো, কত খরচ হবে—সবকিছু অনলাইন, আবার সব চাইনিজ! টানা ২ ঘণ্টা

খাতায় লেখালেখি, ইন্টারনেটে ঘাটাঘাটি। যদিও শিক্ষক বলেছিলেন ট্রেনে আসতে, কিন্তু আমি কখনোই গুইয়াং রেল স্টেশনে যাইনি—ছুয়াংশির বাইরে গেছি কিনা সন্দেহ। এজন্য আমি লেখালেখি করছিলাম। এটা আমার অভ্যাস—কিছু করার আগে রোডম্যাপ বানাই। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় পরিবর্তন, অ্যাপ্লিকেশন, ভিসা—সবকিছুর লেখা আমার ডায়েরিতে আছে।

২৯ জুলাই, সকাল ৯টা আমি গুইজো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডর্ম থেকে চেক আউট করি। ডর্মের আন্টির সাথে ভালো সম্পর্ক ছিলো, তিনি স্যাড ছিলেন। শেষ কথায় বললেন—যদি কোনো সমস্যা হয় উইচ্যাটে কল দিবে, নাহলে মেসেজ, পৌঁছে গিয়ে জানাবে। মুখে একটা বড় হাসি নিয়ে বাই বাই...

ডিডিতে গেলাম, ট্যাক্সি নিলাম। যেতে হতো গুইয়াং ইস্ট রেলওয়েতে, আমি গেলাম গুইয়াং নর্থে। যদিও টিকিট নেওয়ার পর আবার ইস্টে যাই। ট্যাক্সি ড্রাইভার বুঝতে পারেন আমি ঠিকঠাক চাইনিজ পারি না, তবুও যেটুকু পারি সেটুকু দিয়েই যেন অনেক গল্প হয়ে গেলো। নতুন মানুষ হিসেবে মেইন গেটের আগেই নামালেও আমাকে ভালো করে চিনিয়ে দেন কোনদিকে যেতে হবে।

রেল স্টেশন না এয়ারপোর্ট—বোঝা দায়। সুন্দর বাকবাককে চকচকে, ফ্লোরে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। এরপর অপেক্ষার পালা। বারবার ডিসপ্লেতে দেখি, এই ট্রেন

যাচ্ছে, G2186 কবে আসবে! অবশেষে ট্রেনে উঠলাম। মনে এক অজানা ভয়, আবার শান্তিও—যেন নিজের বাড়ি যাচ্ছি। বারবার ঘড়ি দেখা, বাইরের দিকে আনমনে তাকিয়ে থাকা।

সকাল ৮টা ৪৫-এ ছয়াংশান নর্থ স্টেশন—তখন মনে হলো কাঁধ থেকে বড় বোঝা নেমে গেলো। এরপর আশেপাশে তাকিয়ে সিকিউরিটি গার্ডকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে নিয়ে গেলেন, কোথায় যাবো কত ইউয়ান ভাড়া ট্রান্সলেট করে বললেন। যদিও বুঝলেন আমি কিছুটা চাইনিজ পারি, তবুও নিজের মতোই সব করলেন। আবারও ট্যাক্সি ড্রাইভার আর আমি ভাঙাচোরা চাইনিজে কথা বললাম। তার শেষ কথা ছিলো: 欢迎来黄山, 加油।

এইদিনের পুরো যাত্রায় আমার দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকই আমাকে কিছুক্ষণ পরপর মেসেজ দিয়ে খোঁজ নিয়েছেন। আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছাই তখন রাত ১০টার কাছাকাছি। আমাকে থাইল্যান্ডের একটি মেয়ে রিসিভ করে, আমার রুমমেট তাজকিস্তানের। তারা দুজনেই আমাকে গুছিয়ে নিতে অনেক সাহায্য করেছিলো।

পরের দিন ভিসা অ্যাপ্লিকেশন করি। গত ২১ আগস্ট আমি ভিসা পেয়েছি। প্রতিবছরই কিছু স্টুডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয় পরিবর্তন করে—হয়তো স্কলারশিপ থাকে না অথবা ব্যক্তিগত কারণে। তবে আমি কাউকে এভাবে করতে উৎসাহ দেই না, দেবও না। এখানে শুধুমাত্র আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা উল্লেখ করেছি। অন্য বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে জানি না বললেও হবে না—আমার জার্নিটা সফল হয়েছে আমার শিক্ষকদের জন্য।

এই পুরো যাত্রায় আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং বিসিওয়াইএসএ পাশে ছিলো। ধন্যবাদ সবাইকে—অসংখ্য ধন্যবাদ।



জিনিয়া আফরিন
ছয়াংশান বিশ্ববিদ্যালয়, আনহুই।

বাংলাদেশ-চীন কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ক বর্তমানে এক নতুন কূটনৈতিক পর্বে প্রবেশ করেছে, যেখানে ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার, অর্থনৈতিক সহযোগিতা, কৌশলগত অংশীদারিত্ব এবং মানবিক সংযোগ পরস্পরকে সম্পূর্ণ করেছে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক শুরু হয় ১৯৭৫ সালের পর থেকে, যদিও বাংলার সঙ্গে চীনের সম্পর্কের ঐতিহাসিক শিকড় খ্রিষ্টপূর্ব যুগে প্রোথিত। পঞ্চাশ বছরের এ সম্পর্ক আজ আর শুধু রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক পরিসরে সীমাবদ্ধ নেই—এটি সাংস্কৃতিক, প্রজন্মভিত্তিক এবং বহুমাত্রিক।



ঐতিহাসিক পটভূমি: প্রাচীন পথ থেকে আধুনিক কূটনীতির সূচনা বাংলাদেশ ও চীনের সম্পর্কের ইতিহাস বহুপ্রাচীন ও ঘটনাবহুল। খ্রিষ্টপূর্ব ২য় শতক থেকেই চীনা সভ্যতা দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে বৌদ্ধিক, সাংস্কৃতিক এবং বাণিজ্যিক যোগাযোগে

অংশ নেয়, যার অন্যতম কেন্দ্র ছিল আজকের বাংলাদেশ অঞ্চল। ৪র্থ থেকে ৭ম শতকে চীনের বিখ্যাত পর্যটক ফা-স্যান, ইওই চ্যাং এবং শুয়ানজাং বঙ্গ অঞ্চলের বিখ্যাত বৌদ্ধ বিহারসমূহে ভ্রমণ করে তাঁদের ভ্রমণবৃত্তান্তে এর গৌরবময় ঐতিহ্য লিপিবদ্ধ করেন। পরবর্তীতে সিন্ধু রোডের স্থল ও জলপথে চীন ও বঙ্গের মধ্যে স্থাপিত হয় এক শক্তিশালী সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সেতুবন্ধ। মিং রাজবংশের আমলে (১৪০৫-১৪৩৩) অ্যাডমিরাল ঝেং হে-এর নেতৃত্বে চীনা নৌবহর অন্তত দুইবার চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছে। বাংলার শাসক সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ তাঁকে সোনারগাঁও-এ সামরিক সম্মান ও রাষ্ট্রীয় আতিথেয়তায় বরণ করেন। এই সফর ছিল দ্বিপাক্ষিক শ্রদ্ধা, কূটনৈতিক সৌহার্দ্য এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। এমনকি ১৪১৪ সালে বাংলার সুলতান সাইফউদ্দিন হামজা শাহ চীনের মিং সম্রাটকে একটি আফ্রিকান গিরাফ উপহার দেন, যাকে চীনা সংস্কৃতিতে “কুইলিন” বা সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

আধুনিক ইতিহাসে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় চীন পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নিলেও, ১৯৭৫ সালে আনুষ্ঠানিক

স্বীকৃতি ও ১৯৭৬ সালে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে উভয় দেশ সম্পর্কের নতুন অধ্যায় শুরু করে। এরও আগে, ১৯৫০-৬০ দশকে চীনের প্রধানমন্ত্রী ঝোউ এনলাই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সফর করে উভয় দেশের রাজনৈতিক বোঝাপড়ার ভিত্তি রচনা করেন। প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক সময় পর্যন্ত, এই দীর্ঘ ঐতিহাসিক যাত্রা বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ককে এক অভিন্ন সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ করেছে—যার মূলে রয়েছে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহযোগিতা এবং দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারিত্বের আকাঙ্ক্ষা।

বর্তমান বাস্তবতা: বহুমাত্রিক অংশীদারিত্ব

২০২৫ সালে বাংলাদেশ-চীন কূটনৈতিক সম্পর্কের সুবর্ণজয়ন্তী এমন এক সময়কে নির্দেশ করছে, যখন বৈশ্বিক ভূরাজনৈতিক বাস্তবতা দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং আঞ্চলিক অংশীদারিত্ব নতুন আকার নিচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে, ঢাকা ও বেইজিং কেবল আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক উদযাপনেই সীমাবদ্ধ থাকছে না; বরং একটি দীর্ঘমেয়াদি, বহুমাত্রিক অংশীদারিত্বের নতুন কাঠামো নির্মাণে অগ্রসর হচ্ছে। সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশ সরকার চীনের প্রতি যে ২৪টি প্রস্তাবনা পেশ করেছে, তা এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে অর্থনীতি, সংস্কৃতি, শিক্ষা, ক্রীড়া ও জনগণভিত্তিক সহযোগিতার

দিক থেকে এক নতুন দিগন্তে নিয়ে যেতে পারে।

এই প্রস্তাবনাগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

- উচ্চ পর্যায়ের সফর বিনিময়, যা নীতি-নির্ধারকদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ এবং আস্থা বৃদ্ধির সহায়ক হবে। নিয়মিত রাষ্ট্রীয় ও মন্ত্রী পর্যায়ের সফর আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পারস্পরিক অবস্থান সমন্বয়ের একটি কার্যকর মাধ্যম।

- তরুণ নেতৃত্ব, বুদ্ধিজীবী, মিডিয়া ও থিঙ্কট্যাঙ্কদের সফর বিনিময়, যা ভবিষ্যতের মতাদর্শিক ও নীতিগত সংলাপের ভিত্তি গড়ে তুলবে। নন-স্টেট অ্যাক্টরদের মধ্যে এমন বিনিময় কেবল কূটনৈতিক স্তরেই নয়, বরং গভীর জনগণস্তরে বোঝাপড়া বৃদ্ধির মাধ্যম হতে পারে।

- সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং সিস্টার সিটি চুক্তি, যা স্থানীয় জনগণের মধ্যে সাংস্কৃতিক আত্মীয়তা এবং শহরভিত্তিক পারস্পরিক উন্নয়ন উদ্যোগকে উৎসাহিত করবে। এই ধরনের স্থানীয় পর্যায়ের সংযোগ দুই দেশের মধ্যে ‘সফট পাওয়ার’ (Soft Power)-ভিত্তিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে।

- বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা, যা উচ্চশিক্ষা ও উদ্ভাবনী গবেষণার এক অভিন্ন প্ল্যাটফর্ম তৈরিতে সহায়ক হবে। যৌথ গবেষণা, শিক্ষার্থী ও

শিক্ষক বিনিময়, এবং বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চায় আগ্রহ সৃষ্টি—এসব কৌশলগত মানবসম্পদ উন্নয়নের সম্ভাবনা বহন করে।

• ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, যেমন প্রীতি ম্যাচ, চলচ্চিত্র উৎসব, সংগীত ও খাদ্য মেলা—এসব উদ্যোগ তরুণ প্রজন্মকে সাংস্কৃতিকভাবে যুক্ত করে। বিশেষ করে এই ধরনের সফট কূটনীতি মধ্যবর্তী প্রজন্মের মধ্যে পারস্পরিক উপলব্ধি বাড়ায় এবং ভুল ধারণা বা পূর্বাগ্রহ দূর করতে সহায়ক হয়।

• বাণিজ্য প্রদর্শনী ও বিনিয়োগ সেমিনার, যা চীনা বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে ব্যবসায়িক সম্ভাবনা তুলে ধরবে এবং উভয় দেশের মধ্যকার বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাসে ভূমিকা রাখবে। বেইজিং, সাংহাই এবং কুনমিং-এর মতো শহরে অনুষ্ঠিতব্য সেক্টরভিত্তিক মেলা এবং প্রদর্শনী বাংলাদেশের পণ্য ও পরিষেবার জন্য একটি বিশাল বাজার উন্মুক্ত করতে পারে।

এই প্রস্তাবগুলো যৌথভাবে শুধুমাত্র সরকারপর্যায়ের রাজনৈতিক বোঝাপড়াকেই জোরদার করবে না, বরং একটি জনগণকেন্দ্রিক অংশীদারিত্বের কাঠামো গড়ে তুলবে। এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে, রাষ্ট্রের স্বার্থের পাশাপাশি জনগণের সংস্কৃতি, শিক্ষা, উন্নয়ন ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অগ্রগতিকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে—যা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের গভীরতা ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে অপরিহার্য। সার্বিকভাবে, ২০২৫ সালের এই

উদ্যোগগুলোকে শুধু আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে দেখলে ভুল হবে। এগুলো আসলে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের পুনঃসংজ্ঞায়ন, যেখানে দ্বিপাক্ষিকতাকে কৌশলগত সহযোগিতা, নীতিগত বোঝাপড়া এবং সামাজিক সংহতির একটি পুষ্ট কাঠামোতে রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা সুস্পষ্ট। এই বহুমাত্রিক অংশীদারিত্ব ভবিষ্যতের জন্য একটি ‘ট্রাস্ট-আর্কিটেকচার’—যা উন্নয়ন, স্থিতিশীলতা ও আঞ্চলিক ভারসাম্যের ভিত্তিতে নির্মিত।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক: বিনিয়োগ, বাণিজ্য ও বাস্তবতা

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। চীন বর্তমানে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ আমদানি উৎস এবং প্রধান উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ চীন থেকে প্রায় ২ হাজার ১১২ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য আমদানি করেছে, তবে একই সময়ে বাংলাদেশ চীনে মাত্র ৬৮ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে। অর্থাৎ, বাণিজ্য ঘাটতি প্রায় ৩১ গুণ বেশি, যা বাংলাদেশের মোট আমদানির প্রায় ২৫% এবং মোট রপ্তানির মাত্র ১.২২%। এই বাণিজ্য ঘাটতি মোকাবেলায় চীন বাংলাদেশকে ৯৮% পণ্যের ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত

প্রবেশাধিকার প্রদান করেছে। তবে, এই সুবিধার পূর্ণ সদ্ব্যবহার বাংলাদেশি উদ্যোক্তারা করতে পারছে না। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, চীনের বাজারে প্রবেশের জন্য মানসম্মত ও প্রতিযোগিতামূলক পণ্য উৎপাদন এবং বাজার গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

চীন বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পদ্মা সেতু, কর্ণফুলী টানেল, ঢাকা মেট্রোরেল, পায়রা বন্দরসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে চীন সরাসরি বিনিয়োগ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করেছে। সাম্প্রতিক আলোচনায় আরও কিছু বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, যা দেশের উন্নয়নে নতুন মাত্রা যোগ করবে। বাংলাদেশে প্রযুক্তি পার্ক, ৫জি নেটওয়ার্ক বিস্তার এবং ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ বাস্তবায়নে চীনের সহযোগিতা নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিচ্ছে। চীনা বিনিয়োগের ফলে বাংলাদেশের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং স্মার্ট ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে বড় পরিবর্তন আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতেও চীনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কয়লা, সৌর এবং নবায়নযোগ্য শক্তির ক্ষেত্রে চীন উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। বৈঠকে নবায়নযোগ্য শক্তির প্রসার ও বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পগুলোর কার্যকর বাস্তবায়ন নিয়ে

আলোচনা হয়েছে। চীনের সহায়তায় আরও কিছু সৌরবিদ্যুৎ ও বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যা বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, চীনের বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি স্থানান্তরের ফলে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাত আরও টেকসই হবে এবং বিদ্যুৎ সংকট কমবে।

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়নেও সহযোগিতা বাড়ছে। প্রতিবছর হাজারো বাংলাদেশি শিক্ষার্থী চীনে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাচ্ছেন। চীনা ভাষা প্রশিক্ষণ, বৃত্তি এবং গবেষণা সহযোগিতার মাধ্যমে দুই দেশের সম্পর্ক আরও সুসংহত হচ্ছে। বৈঠকে চীনের সহায়তায় বাংলাদেশে নতুন টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এ ধরনের উদ্যোগ বাংলাদেশের তরুণদের দক্ষতা উন্নয়নে সহায়ক হবে এবং শিল্প খাতে দক্ষ জনবল তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশ ও চীনের সম্পর্ক শুধু অর্থনীতি ও বাণিজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি একটি কৌশলগত অংশীদারিত্বে পরিণত হচ্ছে। সাম্প্রতিক বৈঠক দুই দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও গভীর করার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, আগামী দিনে বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ক আরও বহুমুখী ও

কার্যকর হবে। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং চীনের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রভাব একসঙ্গে কাজ করলে উভয় দেশের জনগণই উপকৃত হবে।

সাম্প্রতিক আলোচনাগুলো বাংলাদেশের উন্নয়ন ও চীনের কৌশলগত অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে থাকবে। বিনিয়োগ, বাণিজ্য, প্রযুক্তি, শিক্ষা এবং অবকাঠামো উন্নয়নে চীনের ভূমিকা বাংলাদেশের অগ্রগতিকে আরও ত্বরান্বিত করবে। বাংলাদেশ ও চীনের বন্ধুত্ব আরও সুসংহত হলে উভয় দেশই বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় নিজেদের অবস্থান আরও শক্তিশালী করতে পারবে। সাম্প্রতিক বৈঠক শুধু দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের নয়, বরং এক নতুন যুগের সূচনা করেছে— যেখানে দুই দেশের অর্থনৈতিক ও কৌশলগত সহযোগিতা আরও গভীর ও দৃঢ় হবে।

প্রতিরক্ষা ও কৌশলগত যোগাযোগ

বাংলাদেশ-চীন সম্পর্কের প্রতিরক্ষা খাত উল্লেখযোগ্য ও গতিশীল। বর্তমান বিশ্বরাজনীতির জটিলতায় প্রতিরক্ষা সহযোগিতা কেবল সামরিক শক্তি বৃদ্ধির বিষয় নয়, বরং কৌশলগত স্থিতিশীলতা ও আঞ্চলিক ভারসাম্য রক্ষার এক অপরিহার্য উপাদান। এই প্রেক্ষাপটে, চীন বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম

সরবরাহকারী এবং প্রশিক্ষণ সহযোগী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাম্প্রতিক সময়ে চীনের নির্মিত সাবমেরিন দুটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা দক্ষিণ এশিয়ার জলসীমায় বাংলাদেশের সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। এগুলো দেশীয় জলসীমার সুরক্ষায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া, বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে চীনের তৈরি জেএফ-১৭ খান্ডার যুদ্ধবিমান ব্যবহার করা হচ্ছে, যা আকাশসীমায় আধুনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। পাশাপাশি, সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন ধরনের চীনা সামরিক সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে সামরিক আধুনিকায়নের একটি ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হচ্ছে। দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতা শুধু সরঞ্জাম সরবরাহেই সীমাবদ্ধ নয়; নিয়মিত যৌথ মহড়ার আয়োজন, নিরাপত্তা বিষয়ক তথ্য বিনিময় এবং সামরিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণেও দুই দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রয়েছে। এ ধরনের কার্যক্রম কেবল সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করে না, বরং দুই দেশের মধ্যে আস্থা ও কৌশলগত বোঝাপড়াকে দৃঢ় করে।

দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক জটিলতা, বিশেষ করে ভারতের বৃদ্ধি পাওয়া সামরিক সক্ষমতা ও যুক্তরাষ্ট্রের এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সক্রিয় ভূমিকাকে বিবেচনায় রেখে, বাংলাদেশের কূটনৈতিক

নীতিতে ভারসাম্য ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রেক্ষাপটে, চীন বাংলাদেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যার সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা দেশের নিরাপত্তা ও স্বার্থ রক্ষায় অপরিহার্য। তবে, বাংলাদেশের নিরপেক্ষ ও বহুপক্ষীয় পররাষ্ট্রনীতি বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি অপরিবর্তিত রয়েছে। চীনসহ অন্যান্য কৌশলগত অংশীদারদের সঙ্গে সমন্বয় ও সহযোগিতার মাধ্যমে বাংলাদেশ আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে একটি স্থিতিশীল এবং স্বনির্ভর ভূমিকায় পৌঁছাতে সচেষ্ট। সর্বোপরি, প্রতিরক্ষা ও কৌশলগত যোগাযোগের ক্ষেত্রটি বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চীন বাংলাদেশকে সরঞ্জাম, প্রশিক্ষণ ও কৌশলগত সমর্থন দিয়ে এই মিশনে এক বিশ্বাসযোগ্য অংশীদার হিসেবে অবিচলিত ভূমিকা পালন করছে।

শিক্ষা ও জনগণের সংযোগ: এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে বাংলাদেশ ও চীনের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক শুধু কূটনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নেই; বরং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে এই সম্পর্ক আরও গভীর ও বিস্তৃত হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীনে অধ্যয়নরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা লক্ষণীয় বৃদ্ধি পেয়েছে। চীনা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতিবছর প্রায় ৫০০

থেকে ৭০০ বাংলাদেশি শিক্ষার্থীকে সরকারি ও বেসরকারি স্কলারশিপের আওতায় উচ্চশিক্ষার সুযোগ দিয়ে থাকে। বিশেষ করে টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিসিন এবং ব্যবসায় প্রশাসনের মতো ক্ষেত্রে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বেশি।

তাছাড়া, বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে বিভিন্ন এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামও কার্যক্রমে রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সাংস্কৃতিক সফর, গবেষণা বিনিময়, এবং উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ। এইসব প্রোগ্রামের মাধ্যমে দুই দেশের তরুণরা একে অপরের প্রযুক্তি, সংস্কৃতি ও শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে, যা পারস্পরিক বোঝাপড়া ও বন্ধুত্বের ভিত্তি গড়ে তোলে।

সাংস্কৃতিক দিক থেকে, চীনের কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশে বাংলা ভাষা, চীনা ভাষা ও সংস্কৃতির উপর বিভিন্ন কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন করছে। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাসহ প্রধান শহরগুলোতে কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউট স্থাপনের ফলে স্থানীয় জনগণের মধ্যে চীনা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে। এটি দুই দেশের সাংস্কৃতিক সংযোগকে দৃঢ় করছে এবং বহুমাত্রিক কূটনৈতিক সম্পর্কের মানবিক স্তম্ভ তৈরি করছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা ও গবেষণার পাশাপাশি, বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা চীনের ডিজিটাল প্রযুক্তি, আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) ও

নবায়নযোগ্য শক্তি খাতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। এটি বাংলাদেশে নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এই শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক বিনিময় শুধু বর্তমান প্রজন্মের জন্য সীমাবদ্ধ না থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বোঝাপড়া ও আন্তঃমানবিক বন্ধন গড়ে তুলবে। যা শুধু রাজনীতিতে নয়, জনগণের হৃদয়েও বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ককে অটুট রাখবে এবং দুই দেশের মধ্যে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করবে।

ভূরাজনৈতিক সমীকরণে বাংলাদেশের অবস্থান: বাংলাদেশ সর্বদা একটি ব্যালান্সড পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করেছে। ভারত, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, জাপানসহ সকল কৌশলগত অংশীদারের সঙ্গে সমতা বজায় রেখে দেশটি এগিয়েছে। চীনের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হলেও বাংলাদেশ কখনো কোনো কৌশলগত জোটে যুক্ত হয়নি—এটি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির পরিপন্থতার প্রতিচ্ছবি। তবে নতুন বিশ্বব্যবস্থায়, যেখানে ইউরোপ, ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতির গতিপথ দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে, সেখানে চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক অবশ্যই নতুন মেরুকরণের ইঙ্গিত বহন করে।

চীনের অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় চীনের অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত রূপান্তর বিশ্বব্যাপী উন্নয়নশীল দেশের জন্য এক অনুকরণীয় উদাহরণ। বাংলাদেশ চায়নার অভিজ্ঞতা থেকে নানাভাবে শিক্ষা নিতে পারে:

১. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা

চীনের উন্নয়নের পেছনে সবচেয়ে বড় নিয়ামক হচ্ছে জাতীয় পর্যায়ে ধারাবাহিক পরিকল্পনা (Five-Year Plans)। বাংলাদেশও Vision 2041 এবং Perspective Plan এর মতো নীতির মাধ্যমে একই রকম ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারে।

২. অবকাঠামোর উপর অগ্রাধিকার

চীন জানে, অবকাঠামো ছাড়া শিল্পায়ন ও বিনিয়োগ সম্ভব নয়। বাংলাদেশে মেট্রোরেল, এক্সপ্রেসওয়ে, গভীর সমুদ্রবন্দর—এসব প্রকল্পে চীনের সহায়তা নিয়ে বাংলাদেশও একই দর্শনে এগোচ্ছে।

৩. মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কারিগরি শিক্ষা

চীন তাদের শ্রমশক্তিকে দক্ষ জনসম্পদে রূপান্তর করেছে। বাংলাদেশেও কারিগরি প্রশিক্ষণ, ভোকেশনাল শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়

পর্যায়ে প্রযুক্তি-কেন্দ্রিক শিক্ষায় গুরুত্ব দেওয়া
জরুরি।

৪. বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনে বিনিয়োগ

চীনের উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু এখন AI,
সেমিকন্ডাক্টর, গ্রিন এনার্জি, ও গবেষণা।
বাংলাদেশকেও গবেষণা ও উদ্ভাবন (R&D)
খাতে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে—বিশেষ
করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে।

৫. বিনিয়োগবান্ধব প্রশাসন ও দুর্নীতির নিয়ন্ত্রণ

চীন বেসরকারি ও বিদেশি
বিনিয়োগকারীদের জন্য নীতিগত স্বচ্ছতা
এবং কার্যকর প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে
তুলেছে। বাংলাদেশকে অবিলম্বে এ বিষয়ে
গুরুত্ব দিতে হবে।

৬. এক্সপোর্ট-লিড গ্রোথ মডেল

চীনের শিল্পায়নের মডেল ছিল
রপ্তানিকেন্দ্রিক। বাংলাদেশে গার্মেন্টস ছাড়া
আরও খাতে যেমন ফার্মাসিউটিক্যালস,
আইটি, কৃষিপণ্য ইত্যাদি রপ্তানি বৃদ্ধির
উদ্যোগ নিতে হবে।

উপসংহার

বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ক পঞ্চাশ বছরে
এসে এক নবযুগে প্রবেশ করেছে—যেখানে

ইতিহাসের শিকড়, বর্তমানের বাস্তবতা এবং
ভবিষ্যতের সম্ভাবনা একত্রিত হয়ে একটি
কৌশলগত ও মানবিক মেলবন্ধনের রূপ
নিচ্ছে। এই সম্পর্ক শুধু রাষ্ট্রের শীর্ষপর্যায়ের
সহযোগিতা নয়, বরং জনগণের হৃদয়ে
সঞ্চিত পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বোঝাপড়া এবং
সম্মিলিত অগ্রযাত্রার এক অভিন্ন পথ। নতুন
এই দিগন্তে বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ক শুধু
দ্বিপাক্ষিকতাকে অতিক্রম করে এক
বহুপাক্ষিক, বহুমাত্রিক ও ভবিষ্যতমুখী
অংশীদারিত্বের প্রতীক হয়ে উঠছে—যা আসন্ন
শতকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এক নির্ধারক শক্তি
হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।



মোঃ আবু কাওসার
সহকারী অধ্যাপক, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,
সিলেট
পিএইচডি গবেষক, চাইনিজ একাডেমি অব সায়েন্স
জয়েন্ট সেক্রেটারি, বাংলাদেশ-চায়না ইয়ুথ স্টুডেন্ট
অ্যাসোসিয়েশন

Nanjing to Mountain City Chongqing to Wulong to Chengdu Panda

It was one of my out-of-the-ordinary journeys. I visited these places with my roommate and friends, as we decided on this trip very suddenly. Our winter vacation started after the “tooth break” exam, and we decided to go somewhere and made a not-so-boring plan to travel from Chongqing to Chengdu.



We never thought we could actually do it, but it happened. We checked WeChat and bought plane tickets as soon as possible. Another friend of ours lives in Nanchong; we connected with him and informed him that we had already bought tickets. He was shocked and immediately started looking for train tickets.

After all that, we reached Chongqing, where one mountain meets another. First, we went to Chongqing People’s Square, then the Chongqing Three Gorges Museum, followed by Hongyadong, and finally

Jiefangbei Square, where the 21st floor and 2nd floor appear to be at the same height—amazingly.



Next, we visited Wulong from Chongqing by train, which took less than three hours. We rested for a day at a hotel.

The next morning, the four of us took a taxi via Didi to our destination: the Three Natural Bridges, the filming location for Transformers! From the glass platform, people looked like ants, and the mountains stretched endlessly. We then went down the elevator, walked through a giant donut-shaped mountain hole, crossed a bridge, and reached the Transformers filming site. It was one of the greatest scenes I had ever witnessed. After exploring the mountains, we returned to the hotel.

সম্পর্কের নতুন দিগন্ত: বাংলাদেশ-চায়নার নব মেরুকরণ



My friend was tired, so we decided to go back to his place in Nanchong. He had a tight budget and was exhausted, so he decided not to continue to Chengdu.



But my spirit wasn't down—I wanted to go, and I did. I bought a train ticket from Nanchong to Chengdu and booked a hotel for the day I arrived.

The next morning, I visited the Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding. I saw pandas, peacocks, squirrels, baby pandas, and mother pandas too. Unfortunately, I couldn't see China's famous panda actress Hua Hua because she might have been sick that day.



After that, I explored downtown Chengdu and enjoyed the local cuisine. I also visited the Chengdu Museum. The following day, I took a bus to Sanxingdui, a museum famous for its “alien” artifacts. However, I couldn't get tickets for the daytime and only managed to get tickets for the evening. To kill time, I visited Luocheng Park, which has a lovely village-like environment. At sunset, I went to Sanxingdui and marveled at the ancient architecture and inventions—it was magnificent.

After that night, I returned to Nanchong and then back to Nanjing.



আলমাস ফারহান আরনব,
নানজিং ইউনিভার্সিটি অফ ইনফরমেশন
সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি

চীনে উচ্চশিক্ষা: আমার অভিজ্ঞতা

আমি মিনারা জাহান। বর্তমানে চীনে পড়াশোনা করছি, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে অনার্স ২য় বর্ষে। চীনের শিক্ষাব্যবস্থা গবেষণা, সৃজনশীলতা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর জোর দেয়। ক্লাসরুম লেকচারের পাশাপাশি প্রজেক্ট, প্রেজেন্টেশন, ল্যাব ওয়ার্ক এবং বাস্তব সমস্যা সমাধানে শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে, যা কেবল তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি বাস্তব দক্ষতাও গড়ে তোলে।

চীন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য একটি জনপ্রিয় গন্তব্য। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিক্ষার্থীরা তুলনামূলক কম খরচে বিশ্বমানের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। চীনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আধুনিক ল্যাব সুবিধা, বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি এবং উচ্চমানের একাডেমিক প্রোগ্রামের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত।

চীনের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় QS World Ranking-এ শীর্ষে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ: Tsinghua University, Peking University, Fudan University, Zhejiang University, Shanghai Jiao Tong University। তথ্যপ্রযুক্তি, মেডিকেল, প্রকৌশল, আন্তর্জাতিক ব্যবসা, ভাষা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানসহ অনেক বিষয়ে আধুনিক ও গবেষণাভিত্তিক পাঠ্যক্রম রয়েছে।

ভর্তি প্রক্রিয়া সহজ হলেও নির্দিষ্ট ডেডলাইনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হয়। চীনে

মূলত দুটি ইনটেক আছে: সেপ্টেম্বর ও মার্চ। সেপ্টেম্বর ইনটেকটি প্রধান—স্কলারশিপ ও অন্যান্য সুযোগের জন্য। শিক্ষার্থীদের প্রথমে নির্দিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে গিয়ে পছন্দের কোর্স ও যোগ্যতার ভিত্তিতে আবেদন করতে হয়। পাশাপাশি স্কলারশিপের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবেদন করতে হয়। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় স্কলারশিপ হলো Chinese Government Scholarship (CSC), যা টিউশন ফি, ডর্ম, মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স এবং মাসিক ভাতা সমস্তই কভার করে। এছাড়া Type A, B ও C ক্যাটাগরির (পার্শিয়াল) স্কলারশিপও রয়েছে।

ভর্তি ও স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের পাসপোর্ট, একাডেমিক সার্টিফিকেট, মার্কশিট, মেডিকেল রিপোর্ট (Foreign Physical Examination Form), স্টাডি প্ল্যান/রিসার্চ প্রপোজাল, সুপারভাইজারের অনুমোদন (যদি প্রয়োজন হয়), এবং দুটি সুপারিশপত্র জমা দিতে হয়। আবেদন প্রক্রিয়ায় ইংরেজি দক্ষতার প্রমাণও দরকার হতে পারে—যেমন IELTS স্কোর, যদিও অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে English Capability Certificate/MOI দিয়েও আবেদন করা যায়।

ভিসা প্রক্রিয়া শুরু হয় যখন শিক্ষার্থী চীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অফার লেটার এবং JW202

ফর্ম পায়। এরপর তা নিয়ে ঢাকায় অবস্থিত চীনা দূতাবাসে ভিসার জন্য আবেদন করতে হয়। সাধারণত শিক্ষার্থীরা X1 ভিসা পান, যা দীর্ঘমেয়াদি পড়াশোনার জন্য দেওয়া হয়। প্রাথমিকভাবে এই ভিসা ৩০ দিনের জন্য হয়, পরে চীনে গিয়ে রেসিডেন্স পারমিটে রূপান্তর করা হয়, যা এক বছরের জন্য ইস্যু হয়। প্রতি বছর ভিসা রিনিউ করতে হয়।

চীনে থাকার খরচ তুলনামূলকভাবে কম। একটি শহরে শিক্ষার্থীদের মাসিক খরচ সাধারণত ৭,০০০ থেকে ১৫,০০০ টাকা মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, যদিও শহরভেদে কিছুটা ভিন্নতা থাকতে পারে। ডর্ম ফি অনেক ক্ষেত্রে স্কলারশিপের আওতায় আসে। খাবার, যাতায়াত, মোবাইল ও ইন্টারনেট খরচও সাশ্রয়ী। হালাল খাবারের ব্যবস্থা অনেক জায়গায় সহজলভ্য, এবং বড় শহরগুলোতে বাংলাদেশি কমিউনিটিও রয়েছে, যা নতুন শিক্ষার্থীদের মানিয়ে নিতে সহায়তা করে।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে গেলে, চীনে পড়াশোনা আমাকে একাডেমিক ও ব্যক্তিগতভাবে বিকশিত হতে সাহায্য করেছে। গবেষণা, সৃজনশীলতা এবং বাস্তব জীবনের সঙ্গে পড়াশোনার সমন্বয় অসাধারণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা, বন্ধুত্বপূর্ণ শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা চীনের শিক্ষাকে অনন্য করে তোলে।

চীনে পড়াশোনা করতে এসে সবচেয়ে ভালো লাগার বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা, পরিপাটি ক্যাম্পাস, অনলাইন ও অফলাইন ক্লাস নেওয়ার সুবিধা, এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক বিভাগের জন্য আলাদা সাপোর্ট টিম থাকে, যারা ক্লাস, রেজিস্ট্রেশন, ডর্ম, স্বাস্থ্যসেবা এবং ভিসা রিনিউয়ালেও সহায়তা করে। এছাড়া বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ফেস্টিভ্যাল, ট্যুর ও কর্মশালার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধন গড়ে ওঠে।

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য চীন একটি চমৎকার গন্তব্য, বিশেষ করে যারা প্রযুক্তি, মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং, ব্যবসা বা ভাষা শিক্ষায় আগ্রহী। আমি আশা করি আরও বেশি বাংলাদেশি শিক্ষার্থী চীনে উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী হবে এবং উন্নত ভবিষ্যৎ গড়ার সুযোগ পাবে এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবেশে।



মিনারা জাহান
শিক্ষার্থী, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং
চায়না ওয়েস্ট নরমাল ইউনিভার্সিটি, চীন

মা

পুষ্পসজ্জিত চারিধারে আজ,
বাজে মৃদঙ্গ করতাল।
গগনেতে উজ্জ্বল প্রভাত-রবি
বহিছে পবন প্রকৃতি মাঝে,
লয়ে তব এক সুর,

মা।

জন্মলগ্নে ধরা মাঝে তব
স্নিগ্ধ পরশে জাগে।
তব যেন পহেলা আত্মপ্রকাশ,
প্রকাশে-পরশে বিমহিত হই,
যাহার পরশে জীবনে
মোরা হই সফলকাম।

উচ্চারিত তাহারই যে নাম,
সৃষ্টির কর্তার অগ্রে,
মা।

ডাঃ শিমন সাহা

ক্যাপিটাল মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, বেইজিং, চায়না
মাস্টার্স ইন অর্থোপেডিক্স

সম্পর্কের নতুন দিগন্ত: বাংলাদেশ-চায়নার নব মেরুকরণ



মহাপ্রাচীর সম্পর্কে আপনার মতামত বা পরামর্শ আমাদের জানাতে পারেন ইমেইলের মাধ্যমে:

✉ info@bcysa.org

পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলো অনলাইনে দেখুন:

🌐 <https://www.bcysa.org/magazines>

চীন সম্পর্কিত খবর, স্কলারশিপ, বাংলাদেশ ও চীনের কার্যক্রম জানতে আমাদের ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপে যুক্ত হোন:

ফেসবুক পেজ: www.facebook.com/bcysaofficial

ফেসবুক গ্রুপ: www.facebook.com/group/bcysa.cn

অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আরও বিস্তারিত তথ্য দেখুন:

🌐 www.bcysa.org